দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭৪ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা।। ১০ জানুয়ারি, ২০২২।। ২৫ পৌষ- ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

জাতীয় যুবদিবস

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE NEW AGE PANELS
SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ২৫ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১০ জানুয়ারি - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

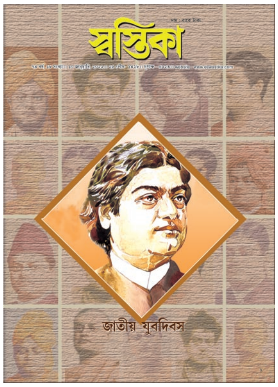

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

মমতার রাজনৈতিক অবস্থান আজও বিভ্রান্তিকর
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

রাজনৈতিক চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ুন ও পড়ান
◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

রমনা কালীবাড়ির রক্তমাখা ইতিহাস ◻ শিতাংশু গুহ ◻ ৮

কলকাতা বইমেলা বিশ্বের প্রাচীনতম বইমেলা বলে দাবি করা অন্যায্য হবে না ◻ রণজিৎ গুহ ◻ ১০

যুব সমাজের কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ১১

স্বামীজীর ভাবনায় নারীশিক্ষা ◻ সন্দীপা বসু ◻ ১৪

স্বামীজী চেয়েছিলেন ভারত হোক আধ্যাত্মিক রাষ্ট্র
◻ রামানুজ গোস্বামী ◻ ১৬

স্বামীজীর মতো দু-একজনই হিমালয়ের চূড়ায় উঠতে পারেন
◻ স্বামী জ্ঞানালোকানন্দ ◻ ২৪

শাশ্বত প্রেরণার উৎস স্বামী বিবেকানন্দ
◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ২৬

সাক্ষাৎকার : ক্যানভাস থেকে রুপোলি পর্দায়
◻ অগ্নিদীপ্তা দে ◻ ২৭

পৌষের পার্বণে স্বাদে আহ্লাদে ◻ শুভ্রা দে ◻ ২৮

মকর সংক্রান্তি ভারতীয় সংস্কৃতির একাত্মদর্শন
◻ মন্দার গোস্বামী ◻ ৩১

রামায়ণ মাহাত্ম্য—নানারূপে, নানা যুগে
◻ কৌশিক রায় ◻ ৩২

স্বামীজীর বৈজ্ঞানিক মানস ◻ সৌমেন নিয়োগী ◻ ৩৪

গ্রেগরিন ক্যালেন্ডারের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই
◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ৩৫

সৌদি আরবের মতো ভারতেও তবলিগ-জামাত নিষিদ্ধ হোক
◻ ধীরেন দেবনাথ ◻ ৪৩

কলকাতা পুরভোট, শ্মশানের শান্তির ভোট
◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ◻ রঙ্গম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮ ◻ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
১৭ জানুয়ারি
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৭ জানুয়ারি
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নেতাজীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত

নেতাজী বরাবরই ব্রিটিশ এবং কংগ্রেসের মাথাব্যথার কারণ হয়েছেন। গান্ধীজী তাঁকে পুত্রের মর্যাদা দিলেও, কংগ্রেসের রাজনীতিতে নেহরুর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠায় নেতাজীকে রেয়াত করেননি। দেশ স্বাধীন হবার পরেও চক্রান্ত বন্ধ হয়নি। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা এইসব চক্রান্ত নিয়ে। লিখবেন— সুজিত রায়, রাজদীপ মিশ্র, শিবাজীপ্রসাদ মণ্ডল, শ্যামল পাল প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার ২৪ **জানুয়ারি ২০২২** তারিখের সংখ্যাটি **স্বাধীনতার ৭৫ বছর অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে** বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। সংরক্ষণযোগ্য এই সংখ্যাটির **মূল্য ৫০.০০ টাকা**। এই তথ্যবহুল সংখ্যাটি অধিকাধিক মানুষের কাছে পৌঁছে যাক এই আশা নিয়ে আপনাদের কাছে বিশেষ আবেদন, সংখ্যাটির বহুল প্রচারের জন্য সহযোগিতা করুন। আপনার কত কপি প্রয়োজন আগামী ৮ জানুয়ারির মধ্যে অবশ্যই জানান যাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যা ঠিকমতো আপনাকে পাঠাতে পারি।

যোগাযোগ—
শ্রীজয়রাম মণ্ডল, মো: ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
৮৬৯৭৭৩৫২১৪

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণের দিন

ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি। এই ভূমিতে যুগে যুগ অবতারকল্প মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই আধ্যাত্মিক বিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ ভারতীয় জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করিয়া জাতিকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ দিয়াছেন। ভারতবর্ষ অসংখ্য দেশভক্ত বীরেরও জন্মপ্রদান করিয়াছে। তাঁহারা জীবনকে পায়ের ভৃত্য জ্ঞান করিয়া দেশমাতৃকার পরাধীনতা মোচনে হেলায় নিজেদের জীবন বলিদান করিয়াছেন। এমনতর অসংখ্য আধ্যাত্মিক বিভূতিসম্পন্ন পুরুষ এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ দেশভক্তের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অনন্য স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি একাধারে আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরষ এবং জ্বলন্ত দেশপ্রেমিক। তাই তাঁহাকে দেশ-বিদেশের মনীষীরা ‘পেট্রিয়ট প্রফেট’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি ভারতের কল্যাণের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজেই ভারতের ঘনীভূত রূপ হইয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ পরাধীনতায় দীর্ণ, জাতপাতের নামে সামাজিক উৎপীড়ন, ছুঁতমার্গ, দারিদ্র ও অজ্ঞতার জন্য দেশের মানুষের শোচনীয় অবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, বিদেশি সংস্কৃতির দাসত্ব, নারীজাতির লাঞ্ছনা ইত্যাদি সমস্যার জন্য তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। তাহার নিরাকরণের জন্য দিবারাত্র চিন্তা করিতেন।

তিনি মনে করিতেন দেশের যুব সমাজের হাতেই রহিয়াছে দেশের কল্যাণের চাবিকাঠি। যুবকদের তিনি বড়োই ভালোবাসিতেন। দেশ গঠনে তাহাদের বিশাল ভূমিকা তিনি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইতেন। তাই তিনি মাতৃভূমির সেবায় তাহাদেরই বারবার আহ্বান করিতেন। তাঁহার কর্মধারা , জ্বালাময়ী ভাষণ ও লেখায় যুব সমাজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত। তিনি যুবকদের মনে করাইয়া দিতেন দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কথা বা কাজ কখনোই করা যাইবে না। তিনি স্মরণ করাইয়া দিতেন, দীর্ঘ পরাধীনতায় ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বহু প্রকার দোষ প্রবেশ করিয়াছে , তাই বলিয়া তাহার কোনোপ্রকার নিন্দা বা সমালোচনা না করিয়া তাহার নিরাকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশমাতৃকার সেবায় অগ্রণী যুবকদের প্রতি তাঁর প্রথম উপদেশ হইল, তাহারা যেন মাতৃভূমিকে তীব্রভাবে ভালোবাসিতে সচেষ্ট হয়। তাহার পর দুর্বলতা পরিহার করিয়া শক্তি সঞ্চয় ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করিতে হইবে। তিনি অনুকরণ করাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করিতেন। তিনি জোর দিয়া বলিতেন,সাম্য, স্বাধীনতা, কাজ ও উৎসাহে পাশ্চাত্য এবং ধর্ম বিশ্বাস ও সাধনায় ঘোর হিন্দু হইতে হইবে। প্রকৃত অর্থে তিনিই ছিলেন ভারত গড়ার কারিগর।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারত ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবনের জন্য স্বামীজীর বাণী ও কর্মকে পাথেয় করিয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা ইত্যাদি নানাবিধ কর্মকাণ্ডে যুব সমাজ আজ অনুপ্রাণিত। তাঁহার সেবার আদর্শে হাজার হাজার যুবক-যুবতী উদ্বুদ্ধ হইয়া আত্মনির্ভর ভারত গঠনে ব্রতী হইয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীর হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমের যে গর্ববোধের সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারত পুনরায় বিশ্বসভায় তাহার যোগ্য স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে। তাই স্বামীজীর জন্মদিন স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা লইবার দিন।

সুভাষিতম্

গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণো
বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি নির্বলঃ।
পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ
করী চ সিংহস্য বলং ন মুষকঃ।।

গুণবান ব্যক্তি গুণের মহত্ত্ব জানেন, গুণহীন ব্যক্তি তা জানে না। বলবান ব্যক্তি শক্তির মহত্ত্ব জানেন, বলহীন জানে না। কোকিল বসন্ত ঋতুর মহত্ত্ব জানে, কাক জানে না এবং হাতি সিংহের শক্তি জানে, ইঁদুর জানে না।

মমতার রাজনৈতিক অবস্থান আজও বিভ্রান্তিকর

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

প্রবাদ : 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী ভাবেন আর কী করেন, তাঁর ডান বা বাঁ হাত জানতে পারে না। এ যাবৎ রাজনীতিতে তাঁর কোনো বিশ্বাসভাজন নেই।' এটাই তাঁর সাফল্য আর চাতুরী। রাজনৈতিকভাবে তিনি কোন পক্ষে কাউকে বুঝতে দেন না। তাঁর এই রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে দলের নেতা-কর্মীরা প্রায়ই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। অনেক সময় বিব্রতও বটে। রাজনৈতিক পালটাপালটির খেলায় মমতায় আসার পর তৃণমূলের এক জাঁদরেল নেতা আমাকে বলেছিলেন, 'ওঁর হাত ছাড়লে আমাদের দশা হবে 'ক্রাই ফ্রম দ্য ওয়াইল্ডারনেস'। কারণ 'দ্য পিপল (মানুষ) ইজ উইথ হার'। অর্থাৎ মমতাকে ছাড়লে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের অরণ্যেরোদন করা ছাড়া আর অন্য কোনও গতি থাকবে না। তাই রাজ্যের সব লোকসভা বা বিধানসভা আসনে মমতা নিজেকে প্রার্থী বলে ঘোষণা করার দম্ভ দেখাতে পারেন।

১৯৯১-এ দিল্লিতে ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করেন মমতা। যাত্রা শুরু করেন কংগ্রেসের হাত ধরে নরসিংহ রাও জমানায়। তারপর ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত চার দফায় বিজেপির ঘরে মন্ত্রিত্ব করেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর জমানায়। এরপর ২০০৯ থেকে ২০১১ পর্যন্ত 'ঘর ওয়াপাসি' হয়ে আবার কংগ্রেসের হাত ধরেন মনোমহন সিংহের জমানায়। ১৯৯৮-এ তৈরি করেন তৃণমূল কংগ্রেস।

লক্ষ্য করার মতো বিষয় যে, ১৯৯১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ২০ বছরের মধ্যে ৪-৫ বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েও কোনও মেয়াদকালই পূর্ণ করেননি মমতা। বাজপেয়ী জমানায় একবছর (২০০৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২০০৪-এর জানুয়ারি পর্যন্ত) দপ্তরহীন মন্ত্রীও ছিলেন। মমতা হয় ক্ষুব্ধ হয়ে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়েছেন নয়তো স্বেচ্ছায় সরে এসেছেন অন্য কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। জোট পালটেছেন বা জোট ভেঙে নিজে দল করেছেন।

২০১১-তে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে তৃণমূল। সঙ্গী ছিল কংগ্রেস। ২০১৬ থেকে তৃণমূলে চলেছে 'একলা চলো রে' নীতি। ২০১১-র পর আর দিল্লিমুখো হননি মমতা। তবে সম্প্রতি সে ইচ্ছা জেগেছে। প্রশান্ত কিশোরের আই-প্যাক সংস্থার রাজনৈতিক বুদ্ধি আর তৃণমূলের 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী' সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে কংগ্রেস-বিজেপি বিরোধী মুখ হয়ে উঠতে চান মমতা।

বাস্তবে তা সম্ভব কিনা সময় বলবে। আমার মনে হয় এখানেও মমতার সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। প্রধানভাবে বিজেপি বা কংগ্রেসকে নিয়ে তাঁর মনোভাব এখনো ধোঁয়াশায় ঘেরা। অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে সমীকরণ নিয়ে মমতার কোনো মাথাব্যথা নেই। মমতা জানেন সব আঞ্চলিক দলই 'হিংসুটে' আর 'স্বার্থপর'। তাই বিরোধী ঐক্য একটা 'কল্পনা'। আঞ্চলিক দলগুলো পিঠ বাঁচাতে সদা ব্যস্ত। বিজেপি বা কংগ্রেসকে টক্কর দেওয়ার মতো ক্ষমতা বা ধৈর্য তাদের কোনোটাই নেই। সব চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

তৃণমূলও তাই। তফাত একটাই। কংগ্রেস বা বিজেপির জাতীয় সমীকরণে প্রবেশ করার কায়দা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন। বাকিরা জানেন না। ওই দুই বড়ো দলের সঙ্গে ঘর করার অভিজ্ঞতা আর ঘনিষ্ঠতা কেবল মমতারই রয়েছে। বাকিরা কেবল তাঁদের আশপাশে ঘুরেছে। ঘর করেনি। বিরোধী মুখ— স্ট্যালিন, শরদ পাওয়ার, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, তেজস্বী যাদব বা অখিলেশ ও মায়াবতী কোনোদিন বিজেপি বা কংগ্রেসের সঙ্গে একসঙ্গে ঘর করেনি। তাই তাদের দুর্বলতা তাঁরা জানেন না। শরদ পাওয়ার এ ব্যাপারে খানিকটা পারদর্শী হলেও তাঁর নিজের রাজনৈতিক অবস্থান এতটাই ঘোলাটে যে নরেন্দ্র মোদী বা সোনিয়া গান্ধীর বিকল্প মুখ হয়ে ওঠা তার পক্ষে কোনওভাবেই সম্ভব নয়। অগত্যা মমতা।

তৃণমূল নামে সর্বভারতীয় দল হলেও আদতে আঞ্চলিক। কমিউনিস্টরাও তাই। তারা এখন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়ে ক্ষুদ্র হয়ে গিয়েছে। কমিউনিস্টরা কেরল ছাড়া অন্য কোথাও আছে বলে শুনিনি। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকই মমতাকে 'আনপ্রেডিকটেবল অ্যাজ ওয়েদার' বলে থাকেন।

অর্থাৎ 'আবহাওয়ার মতো' তিনি নিজেকে পালটে ফেলতে পারেন। ফলে রাজনৈতিক ঘোলা জলে মাছ ধরতে মমতার মুনশিয়ানা এঁদের থেকে অনেকটাই বেশি। তাই মানুষের মনে ভ্রম তৈরি হয়। মেঘের আড়াল থেকেই তির ছুঁড়তে পারদর্শী মমতা। তবে কতদিন? মেঘ তো একদিন কাটবেই। সে আশায় রইলাম। ▯

> **রাজনৈতিক বিশ্লেষকই মমতাকে 'আনপ্রেডিকটেবল অ্যাজ ওয়েদার' বলে থাকেন। অর্থাৎ 'আবহাওয়ার মতো' তিনি নিজেকে পালটে ফেলতে পারেন। ফলে রাজনৈতিক ঘোলা জলে মাছ ধরতে মমতার মুনশিয়ানা এঁদের থেকে অনেকটাই বেশি।**

রাজনৈতিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ুন ও পড়ান

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

আপনারা আশা করি ভালো আছেন। তবে করোনার যে ঢেউ এবার এসেছে তাতে কে কখন সংক্রমিত হবেন তা বোঝা মুশকিল। তাই সকলকে সাবধানে থাকতে বলা ছাড়া কোনও উপায় নেই। একই সঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, নিজের মতো করে, নিজেদের মতো করে ভালো থাকুন। রাজ্য সরকারের উপরে ভরসা করতে যাবেন না। কারণ সরকার বাহাদুর জানেই না কী করতে হবে। সব কিছুতেই রাজনীতি খোঁজা আমার দিদির কাজ। আপনারা খারাপ ভাবলেও কিছু করার নেই। দিদিকে রাজনীতি করেই থাকতে হয়। উনি কোনওদিন প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না জেনেও ওই প্রচারটা করে যেতে হয়। গোয়া অনেক দূর ত্রিপুরায় ঠাঁই মেলা দায় হলেও উত্তরপ্রদেশ থেকে গুজরাটের স্বপ্ন দেখে যাওয়াটা কাজ। ভাইপো গোয়ায় গিয়ে বাবু হয়ে বসে পুজোও দিচ্ছেন। এসবই রাজনীতি। দিদি সেটা ভালো বোঝেন। সবাইকে গোল্লা দিয়ে দিতে পারেন। সবাই ভাবছে একদিন দিদি প্রধানমন্ত্রী হবেন গোটা দেশে দুয়ারে সরকার হবে। সব মহিলাকে মাসে ৫০০ টাকা দিয়ে উনি কিনে নেবেন। গায়ে লাগলো! ‘কিনে নেওয়া’ শব্দবন্ধে আপত্তি থাকলে পড়ুন ‘মাথা কিনে নেওয়া’। এছাড়া কী বলা যায় বলুন তো! আপনারাই বলুন। আমি বরং শিখে নেব।

যত রাগ ওই লোকাল ট্রেনের উপরে। আচমকা বলে দিলেন সন্ধে ৭টার পরে লোকাল ট্রেন চলবে না। বিকেল বেলার ট্রেনে গাদাগাদি ভিড় হলেও করোনা ছড়াবে না। কিন্তু সাতটার পরে টেনে উঠলেই করোনা। এটাকে বলে রাজনৈতিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। রাতারাতি সেই বিক্ষোভ বদলে যায়। চন্দননগরের এক তৃণমূল নেতা ফোন করে বললেন, দাদা, অবস্থা খুব খারাপ। ট্রেন নির্ভর বাসিন্দারা বলছেন লোকাল বন্ধ মানে ভোট বন্ধ। যেই না চিকিৎসা রাজনীতির গবেষক দিদির কানে গেল অমনি দিদি বলে দিলেন, রাত ১০টা। মানে রাত ১০টা পর্যন্ত ট্রেন ছাড়লে কোনও সমস্যা নেই। সেই ট্রেন গন্তব্যে রাত ১২টাও পৌঁছলেও নেই। ততক্ষণে আবার নাইট কার্ফু শুরু হয়ে যাবে। পুলিশ ভাইয়েরা দুপয়সা কামিয়ে নেবে ট্রেন থেকে নামা যাত্রীদের কার্ফু ভাঙার অপরাধে। কেউ কেউ বলছেন, রাত ১০টা পর্যন্ত হাওড়া, শিয়ালদহ থেকে ট্রেন ছাড়লে বাকি থাকে গোটা দশেক লোকাল। তাতে আর কত যাত্রী! তাতে কি করোনা আটকাবে! এই তো নয়! বললেই হলো। দিদি কিন্তু রাজনৈতিক চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করেছেন। আপনি নন। সুতরাং, আপনি জ্ঞান দিতে আসবেন না।

বড়দিন নিয়ে দিদি কিন্তু কোনও বাধা দেননি। কারণ ওই একটাই। রাজনৈতিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। করোনা ভাইরাসের মতো ক্রমাগত রূপান্তরশীল এক শত্রুর সঙ্গে যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন ভাবে লড়তে হবে, সংক্রমণ মোকাবিলার পথ বারবার বদলাতে হবে। কিন্তু প্রয়োজনানুগ বদল এক জিনিস আর অব্যবস্থিত চিত্তে হতে কাজ করা আর এক জিনিস। পশ্চিমবঙ্গে কোভিড-১৯-এর মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের আচরণে দ্বিতীয়টির উপসর্গ বেশি দেখা যাচ্ছে বলে অনেকে বলছেন। কারণ, সংক্রমণ যে বাড়বে, এই সম্ভাবনা অজানা ছিল না। সেই বৃদ্ধি অভূতপূর্ব গতি নিতে পারে তারও ইঙ্গিত এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলেছিল। দুনিয়ার বিশেষজ্ঞরাও এই বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। এই অবস্থায় রাজ্য সরকারের কর্তব্য ছিল বড়ো জনসমাগম নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হওয়া। কিন্তু তারা কেউ তো দিদির বিষয় মানে রাজনৈতিক বিজ্ঞানটা পড়েননি। সেটা পড়লে বুঝতে পারতেন এই রাজ্য কেন তিন দফায় পুরভোট করাতে হবে। ‘উৎসবের মরসুম’-এ জনসমাগমের নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলিকে আরও শিথিল করে দিতে হবে। দিতেই হবে। ভোটের তৃতীয় সূত্র তাই বলছে। মানে রাজনৈতিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে। নাগরিকেরা তাই বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষ পালনে বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও গাইতে গাইতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। কী বলছেন? এই বিস্ফোরণের দায় রাজ্য প্রশাসনের চালকরা অস্বীকার করতে পারেন না! তারা উৎসবপ্রেমী সমাজকে খুশি রাখতে গিয়ে বৃহত্তর সমাজের বিপদ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন! বলতেই পারেন। আপনারা বলতেই পারেন। কারণ, আপনারা দিদির ওই বইটি পড়েননি। পারলে রাজনৈতিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পুস্তকটির পাতা উলটে দেখুন।

সেখানেই দেখতে পাবেন একটা চ্যাপ্টার। যেটির নাম, স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিলেও পানশালা খোলা রাখতে হবে। এবং সেটা নাইট কার্ফুর তোয়াক্কা না করেও। সেই বই মেনে দিদির সরকার নিয়ম করেছে, রাত ১০টায় পানশালা বন্ধ এবং নাইট কার্ফু শুরু। মানে যিনি ১০টায় পান করে বের হবেন তিনি যেন পানশালার দুয়ারেই রাত কাটিয়ে ফেলতে পারেন। কিংবা টলোমলো পায়ে বাড়ি ফিরলেও পুলিশ কাকুরা স্যালুট করবেন। কারণ, পানশালা আর পানের দৌলতেই তো বেতন হয় রাজ্যে। □

রমনা কালীবাড়ির রক্তমাখা ভয়ংকর ইতিহাস

শিতাংশু গুহ

ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ রমনা কালীমন্দির উদ্বোধন করেছেন। ভারত সরকারের টাকায় এটি পুনর্নির্মিত হয়েছে। ভারতের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ঠিক জানি না ভারত সরকার কত টাকা দিয়েছে, শুনেছি ৭ কোটি টাকা। এ তথ্য সত্য হলে প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশ সরকার এ সামান্য টাকাটা মঞ্জুর করল না কেন? সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত অনেকদিন আগেই বলেছেন, ৪ হাজার কোটি টাকা কোনো টাকাই না! তাহলে মাত্র ৬ কোটি টাকা না দেওয়ার কারণ কী? বাংলাদেশ সরকার ৫৬০টি আধুনিক মসজিদ বানাচ্ছে। জনসংখ্যা হিসেবে অন্তত ৫৬টি মন্দির এবং ১টি প্যাগোডা ও ১টি গির্জা নির্মাণ করা দরকার, তা হচ্ছে না। এতেই সংখ্যালঘুদের প্রতি সরকারের 'অগাধ ভালোবাসা' প্রমাণ হয়। এ সময়ে আমরা রমনার ইতিহাসটা একটু ঘুরে দেখি।

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সেদিন ঢাকার বিখ্যাত রমনা কালীবাড়িটি ধ্বংস করেছিল। হত্যা করা হয়েছিল শ'খানেক মানুষকে। সেই দুঃখজনক ঘটনা আজ বিস্মৃতপ্রায়, অথচ কয়েকশো বছর পুরানো এই মন্দিরের সঙ্গে ঢাকার ইতিহাস জড়িত। রমনা কালী মন্দিরের সুউচ্চ চূড়া বহুদূর থেকে দৃশ্যমান ছিল। দেখেই বোঝা যেতো ওটি রমনা কালীবাড়ি। ধ্বংসের পর সেই চূড়াও নেই, নেই সেই ঐতিহ্যবাহী কালীমন্দির। যা ছিল তা ভগ্নাবশেষ।

ঠিক একই জায়গায় না হলেও রমনা কালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ক্ষুদ্র পরিসরে এখন রমনায় যেটুকু দাঁড়িয়ে আছে, তা মূলত অনেকটা জোর করে আদায় করে নেওয়ার মতো। পাকিস্তানি খানসেনা এটি ধ্বংস করে আর বঙ্গবন্ধুর সরকার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বুলডজার দিয়ে পরিষ্কার করে। এরপর এটি অধিগ্রহণ করে স্থানীয় প্রশাসন গণপূর্ত

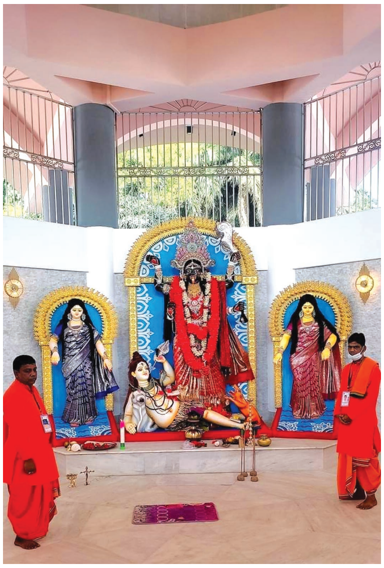

মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত করে। দীর্ঘদিন সেখানে পূজার্চনার কোনো সুযোগ ছিল না। এরশাদ আমলে আশির দশকে ওয়াইজ ঘাটের 'ভিআইপি স্যুজ'-র মালিক জনক 'রতন' স্বাধীনতার পর প্রথম সেখানে পূজা করেন। পুলিশ বাধা দেয়নি। এ খবরটি তখনকার দৈনিক দেশ পত্রিকায় সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছিল। রমনা কালীমন্দির নামে এখন যেটুকু আছে, সেটি মূলত বিএনপি আমলে গয়েশ্বর রায় ফিরিয়ে আনেন। বর্তমানে ভারত সরকারের সহায়তায় মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ হলো।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান খানসেনা 'অপারেশন সার্চলাইট' চলাকালে রমনা কালীমন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রমটি ধ্বংস করে। ২৭ মার্চ খানসেনারা মন্দিরে ৮৫ জনকে হত্যা করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ২৬ মার্চ মন্দিরে প্রবেশ করে, ঘেরাও করে রাখে, কাউকে বের হতে দেয় না। ২৭ মার্চ রাতে কার্ফু চলাকালীন সার্চলাইট জ্বালিয়ে মন্দিরের সবাইকে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে রেখে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী পরমানন্দ গিরি ছিলেন। জানা যায়, মৃত্যুর আগে তিনি অন্যদের বলে গেছেন, তোমাদের বাঁচাতে পারলাম না, কিন্তু দেশ স্বাধীন হবে। হত্যাকাণ্ড শেষে বোমা মেরে মন্দির উড়িয়ে দেওয়া হয়। কথিত আছে, খাঁজা খয়েরুদ্দিন তখন পাক-সেনাদের সঙ্গে মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন।

সেদিন রমনা কালীমন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রমে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের কয়েকজনের একটি তালিকা আছে। এঁরা হলেন, শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ গিরি, রঘুলাল দাস, বিভূতি চক্রবর্তী, নান্দু লাল, সরোজ, রাজকুমার, গণে মুচি, বলিরাম সুরত বল্লি, ধীরেনলাল ঘোষ, শ্রীমতী লক্ষ্মী চৌহান, হীরালাল পাশী, বাবুলাল, সূর্য, রামগোপাল, সন্তোষ পাল, সুনীল ঘোষ, মোহন দাস, রামবিলাস দাস, জয়ন্ত চক্রবর্তী, বিরাজ কুমার, ভোলা পাশী, বাবুলাল দাস, গণেশ চন্দ্র দাস, সরযু দাস, বসুন্ত মালী, শৈবল্লি, কিশোরী ঠাকুর, সাংবাদিক শিব সাধন চক্রবর্তী, পুরণ দাস, মানিক দাস, রমেশ ধোপা, বাবুনন্দন, হিরুয়া, বাবুল দাস দ্রুপতি, বাদল চন্দ্র রায়, ত্রিদিব কুমার রায়, রামগতি ও বারিক লাল ঘোষ।

মোগল আমল থেকে দেবী 'কালী'র নামানুসারে রমনা কালীবাড়ি। এর আয়তন ছিল ২.২৫ একর। এটি রমনা পার্কের দক্ষিণ ও বাংলা অ্যাকাডেমির উলটোদিকে অবস্থিত। পাকিস্তানি সেনা ২৭ মার্চ এই মন্দিরে হত্যাযজ্ঞ চালায়। নিহতদের সবাই হিন্দু। নেপালি লোক সংস্কৃতি থেকে জানা যায়, হিমালয় থেকে কালীভক্তরা বাঙ্গলায় এসে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও মন্দিরটি বহু শতাব্দী পুরানো, তবে এর মূল উন্নয়ন ঘটে রাজেন্দ্র নারায়ণের স্ত্রী রানি বিলাসময়ী দেবী'র সহযোগিতায় (১৮৮২-১৯১৩)। ওই সময় এটি ঢাকার একটি ল্যান্ডমার্ক ছিল। সুরজিৎ ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, জনশ্রুতি আছে যে, নেপাল থেকে এক হিন্দু কালীভক্ত এসে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। পরে ভাওয়ালের রানি বিলাসমণি দেবী এটি সংস্কার করেন। মানসিংহ ও বারভুঁইয়ার কেদার রায় আবার নতুন করে

মন্দিরটি নির্মাণ করে নাম দেন ভদ্রকালী বাড়ি। কালক্রমে এটি রমনা কালীবাড়ি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আশ্রমের পাশে একটি বিরাট দিঘি। রানি বিলাসমণি এটি খনন করেন। এই দিঘি আশেপাশের সবাই ব্যবহার করতেন এবং এটি ছিল ব্যায়াম ও সাঁতারের জন্যে উন্মুক্ত।

মন্দিরের ধ্বংসকাহিনি কোথাও লিপিবদ্ধ ছিল না। মূলত মানুষের মুখে মুখে এটি প্রচারিত ছিল। ২০০০ সালে আওয়ামি লিগ সরকার এবিষয়ে গণশুনানির লক্ষ্যে 'রমনা কালীমন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম ধ্বংস ও গণহত্যা কমিশন' গঠন করে। ৬ সদস্যের এই কমিশনের সদস্যরা ছিলেন বিচারপতি কে এম সোবহান, চেয়ারম্যান; প্রফেসর মুনতাসির মামুন, সদস্য; লেখক শাহরিয়ার কবির, সদস্য; সাংবাদিক বাসুদেব ধর, সদস্য সচিব; দ্বীপেন চ্যাটার্জি ও চন্দ্রনাথ পোদ্দার, সদস্য। কমিশনের দায়িত্ব ছিল (ক) ২৭ মার্চ ১৯৭১-এ রমনা কালীমন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রমে গণহত্যায় নিহতদের তালিকা প্রস্তুত করা, (খ) প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য নিয়ে হতাহত, ভুক্তভোগীদের ওপর অত্যাচার, খুন ও মন্দির ধ্বংসের বিবরণ সংগ্রহ করা, (গ) মন্দির ও আশ্রমের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরা, (ঘ) মন্দির ও আশ্রম ধ্বংসের কারণ নির্ণয় বা ভবিষ্যতে মন্দির পুনর্নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রতিনিধিদের মতামত নেওয়া এবং (ঙ) মন্দির ও আশ্রম পুনর্নির্মাণে ১৯৭২ সাল থেকে নেওয়া উদ্যোগ এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিষয় তুলে ধরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে ১৩ এপ্রিল ২০০০ থেকে ৫ মাস ব্যাপী এক গণশুনানিতে প্রায় একশোর বেশি মানুষ সাক্ষ্য দেন। এর চেয়ারম্যান বিচারপতি কে এম সোবহান ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট সরকারের করাছে জমা দেন। কমিশন প্রায় ৫০ জন অভিযুক্তকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। সাক্ষ্যদানকালে প্রত্যক্ষদশীরা জানান, ২৬ মার্চ পাকিস্তানি খানসেনা সকাল ১১টায় রমনা কালীমন্দির ও মা আনন্দময়ীর আশ্রমে প্রবেশ করে। তারা এদুটি ঘেরাও করে রাখে। কাউকে বাইরে যেতে দেয়নি। এই সময় মুসলিম লিগ নেতা খাজা খয়েরুদ্দিন পাকসেনাদের সঙ্গে ছিলেন। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় কার্ফু শুরু হয় , রাত ২টায় সার্চলাইট জ্বালিয়ে শুরু হয় হত্যালীলা। এসময় কামান থেকে গোলা ছোড়া হয় এবং মন্দিরে বিস্ফোরক ছোড়া হয়। এতে মন্দিরের পেছনের অংশ ও মূর্তি ধ্বংস হয়। মন্দিরের পুরোহিত ও সেবাইতরা ভয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে কিন্তু খানসেনারা তাদের ধরে লাইন করে দাঁড় করায়। লুকিয়ে থাকা মহিলাদের বেয়নটের মুখে বের করে এনে লাইনে দাঁড় করানো হয়। মহিলা ও শিশুদের একটি এবং পুরুষদের অন্য লাইনে দাঁড় করানো হয়। লাইনের একেবারে সামনে দাঁড় করানো হয় মন্দিরের পুরোহিত পরমানন্দ গিরিকে। তাঁকে দিয়ে জোর করে কলমা পড়ানো হয় এবং পরে বেয়নট দিয়ে খুঁচিয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয়। অন্যদের একই কায়দায় এবং ব্রাসফায়ারে হত্যা করা হয়। এই হত্যালীলা যখন চলছিল, রমনা কালীমন্দির তখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। এসময় প্রায় ১০০ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় বলে জানা যায়।

প্রথমে পুরুষদের হত্যা করতে দেখে মহিলারা চিৎকার করতে শুরু করলে তাদের রাইফেলের বাঁট দিয়ে যে আঘাত করা হয় তাতে অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। হত্যালীলা শেষ হলে খানসেনারা হতাহত সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেয়। অনেককে হত্যার আগে 'জয় বাংলা' বলতে বাধ্য করা হয়। মন্দিরের গোশালায় তখন ৫০টি গোরু ছিল, এসব অবোলা প্রাণীও রক্ষা পায়নি। ভোর ৪টায় 'অপারেশন রমনা' শেষ হয়। এই দুই ঘণ্টা আর্তচিৎকার, মানুষপোড়া গন্ধ, গুলি-বোমার শব্দে রমনা কালীবাড়ি মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। খানসেনারা কয়েকজন যুবতীকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, যাবার সময় তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে তারা ১২ জন যুবতীকে ধরে নিয়ে যায়, যাদের আর কখনোও খোঁজ পাওয়া যায়নি। মন্দিরের পুরোহিতের স্ত্রী সুচেতা গিরি বা জটালি মা এবং অন্য কয়েকজন কোনোভাবে বেঁচে যান, তাঁরা পরদিন সকালে নিহত প্রিয়জনদের ফেলে পালিয়ে যান।

কালীবাড়ির অনতিদূরে শাহবাগ মসজিদের খাদেম প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল আলি ফকির জানান, খানসেনারা সবাইকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ও 'লা-ইলাহা-ইল্লাহু' বলতে বাধ্য করে। বেঁচে যাওয়াদের মধ্যে একজন লক্ষ্মীরানি জানান, তার বাবা কিশোর ঠাকুর ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মুক্তাগাছা থেকে তাকে দেখতে মন্দিরে আসেন। লক্ষ্মীরানি স্বামী-সহ রমনা কালীমন্দিরে থাকতেন। খানসেনারা তার বাবাকে লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করে এবং মৃতদেহ আগুনে নিক্ষেপ করে। দৈনিক ইত্তেকাফের সাব এডিটর আহসান উল্লাহ জানান, তিনদিন পর তিনি রমনা কালীমন্দিরে গিয়ে মন্দিরের ভেতরে ১০টি লাশ এবং বাইরে ১৪টি আধপোড়া গলিত লাশ দেখতে পান। বেঁচে যাওয়া আরও এক প্রত্যক্ষদর্শী কমলা রায় জানান, খানসেনারা চারদিক থেকে মন্দির ঘিরে ফেলে। ভয়ে মহিলারা হাতের শাঁখা ও সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেন। পুরুষদের মাটিতে ফেলে মারা হয়। তারপর আগুনে ফেলে দেওয়া হয়।

কমিশন সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়া কেউ থাকলে বা তাঁদের নিকট আত্মীয় কেউ থাকলে তাঁদের নামধাম জমা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল, যাতে ভবিষ্যতে কোনও স্মৃতিসৌধ নির্মিত হলে ওইসব নাম তাতে স্থান পায়। ডেইলি স্টার জানায়, ২০০৬ সালে ২২ জুন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ খালেদা জিয়াকে মন্দিরটি স্থানান্তর না করার জন্য একটি স্মারকলিপি দেয়। ইয়াহু নিউজ জানায়, মন্দিরের জন্য অন্য স্থানে জমি বরাদ্দ করার অনুমোদন না করার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান গয়েশ্বর রায়। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান মন্দিরটি স্থানান্তর করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হিন্দুরা তা মেনে নেয়নি। মায়ের ডাক পত্রিকা লিখেছে, পাকিস্তানি খানসেনারা মন্দির ধ্বংস করেছে, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার মন্দিরের জমি ঢাকা ক্লাবকে দিয়েছে। রমনা কালীমন্দির ফিরে পেতে ১৯৮৪ সালে সিভিল কোর্টে মামলা হয়েছে, তবে মামলার রায় শেষপর্যন্ত কী হয়েছে তা অজানা। শেষপর্যন্ত ভারত সরকারের সৌজন্যে রমনা কালীমন্দির আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। □

কলকাতা বইমেলাকে বিশ্বের প্রাচীনতম বইমেলা বলে দাবি করা অন্যায্য হবে না

রণজিৎ গুহ

পশ্চিমবঙ্গে বইমেলার ইতিহাস বেশ পুরানো। বছর তিনেক আগেই পালিত হয়েছে আমাদের দেশের বইমেলার শতবার্ষিকী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ, ডাঃ নীলরতন সরকার ও সেই সময়ের আরও অনেক বিশিষ্ট জনদের উদ্যোগে ১৯১৮ সালে সংগঠিত হয়েছিল বইমেলা। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ও বাংলা প্রকাশনার সদর দপ্তর কলকাতার কলেজ স্ট্রিটেই হয়েছিল এই মেলার আয়োজন। এই বইমেলাই আমাদের দেশের প্রথম বইমেলা। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন তৈরি হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত তদানীন্তন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের উৎসাহেই আমাদের দেশের প্রথম বইমেলা বাস্তব রূপ পায়। এই মেলায় অন্যান্য প্রকাশক ও বিক্রেতার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে উপস্থিত ছিল বাবাণসীর মোতিলাল বেনারসীদাস নামে পুস্তক প্রকাশক ও অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স। ২০১৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্যোগে আমাদের দেশের বইমেলার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত পুস্তক প্রদর্শনীতেও ওই দুই প্রকাশক তাঁদের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। যে কোনো প্রকাশনা সংস্থার শতবর্ষ ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কর্ম বিস্তার নিসন্দেহে অতি গৌরবজনক।

১৯১৮ সালে কলকাতায় আয়োজিত বইমেলা শুধু যে আমাদের দেশেই প্রথম তা নয়, বিশ্বের প্রাচীনতম বইমেলার অন্যতম দাবিদার। যদিও জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের বইমেলা আভিজাত্য ও ব্যাপকতায় বিশ্বসেরা সুনাম অর্জন করেছে কিন্তু তার শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৯ সালে। যদিও এই বিশ্বখ্যাত বইমেলার একটা প্রায় ৫০০ বছরের পরম্পরার জোরালো দাবি আছে। ফ্রাঙ্কফুর্টের কাছেই মিনেজ শহরে সম্ভবত ১৪৬০ সালে বইয়ের লেখক, প্রকাশক ও বিক্রেতারা মিলে মুদ্রিত সম্ভারের নানা নমুনার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সম্ভবত এটাই পৃথিবীর প্রথম সংগঠিত বইমেলার শিরোপা পাওয়ার যোগ্য। অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই পুস্তক প্রদর্শনীর কোনো লিখিত বিবরণ সংগ্রহ করা যায়নি। কাজেই ১৯১৮ সালের কলকাতার বইমেলাকে বিগত তিন শতাব্দী সময়কালে বিশ্বের প্রাচীনতম বইমেলা বলে দাবি করা খুব অন্যায্য হবে না। এই বইমেলাও পরবর্তী বছরগুলিতে নিয়মিত সংগঠিত হয়েছিল কিনা তার সাক্ষ্যপ্রমাণ কোনো ইতিহাসবিদ এযাবৎ পেশ করেননি। তবে কলকাতার পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলারস গিল্ড পরিচালিত এখনকার বইমেলা সর্বাধিক জনপ্রিয় বইমেলা হিসেবে বিশ্ব দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে। সাম্প্রতিকতম কলকাতা বইমেলায় প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ পরিদর্শনে এসেছিলেন।

১৯৭২ সালে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট দিল্লিতে প্রগতি ময়দানে ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ারের আয়োজন করে। দেশবিদেশের প্রায় ২০০ প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা এই মেলায় অংশ নেন। উদ্বোধন করেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি। স্বাধীন ভারতের এটিই প্রথম বইমেলা। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় খুবই কম দামে নানা ধরনের বই প্রকাশ করে। এই বইগুলো বিপুল সংখ্যক পাঠকের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়। কলকাতার কয়েকজন তরুণ প্রকাশক এই মেলার বাণিজ্যিক সাফল্য দেখে আকর্ষিত হন। কলকাতায় ফিরে বিস্তারিত আলোচনার পর পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলারস গিল্ড গঠন করেন। প্রচুর তর্ক- বিতর্কের পর এই গিল্ডের উদ্যোগ ও পরিচালনায় ১৯৭৬ সালে ৫ মার্চ কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসের উলটো দিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশে ক্যালকাটা বুক ফেয়ার শুরু হয়। উদ্বোধন করেন তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মেলায় অংশ নিয়েছিল ৩৪টি প্রকাশনা সংস্থা। মোট স্টলের সংখ্যা ছিল ৫৬টি। মেলায় প্রবেশ মূল্য ছিল ৫০ পয়সা।

১৯৭৬ থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই বইমেলা হয়ে চলেছে (গত বছর করোনা আবহে হতে পারেনি)। ১৯৭৯ সালে বাংলা প্রকাশনা শিল্পের দুশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতার রবীন্দ্র সদনের উলটো দিকে আনন্দবাজার পত্রিকা একটি পৃথক পুস্তক প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করে। ১৯৭৬ সালে শুরু হওয়া ক্যালকাটা বুক ফেয়ার অনতিবিলম্বে আন্তর্জাতিক বইমেলা হয়ে ওঠে। ১৯৮৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা বইমেলাকে আন্তর্জাতিক বইমেলা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বইমেলা শুরু হওয়া মাত্র সাত বছরেই এই স্বীকৃতি পাওয়া নিসন্দেহে খুব কৃতিত্বের।

১৯৮৮ সালে বইমেলা সরে আসে কলকাতার পার্কস্ট্রিট সংলগ্ন ময়দানে। বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে বইমেলাতে শুরু হয় বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক আলোচনা, বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর। ১৯৯১ সাল থেকেই কলকাতা বইমেলায় প্রতিবছর একেকটা ফোকাল থিম ঠিক করা হয়। প্রথম কয়েক বছর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নামে হওয়ার পর ১৯৯৭ সালে ফোকাল থিম হয় ফ্রান্স। এই বছরেই বইমেলায় এক বিধ্বংসী আগুনে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।

২০০৭ সালে আদালতের নির্দেশে বইমেলা কলকাতার ময়দান থেকে সল্টলেকে খানিকটা ছোটো পরিসরে স্থানান্তরিত করা হয়। ২০১৪ সাল থেকেই বইমেলায় শুরু হয় তিনদিন ব্যাপী সাহিত্য উৎসব। জেলা বা মহকুমা সদর শহরের বইমেলাগুলিতে বইপত্র প্রদর্শনী ও বিক্রি ছাড়াও উল্লেখযোগ্য ভাবে সাহিত্যকর্মী, অনুরাগী এবং অন্যান্য শিল্পী সৃজনকর্মীরা নিজেদের সৃষ্টি নিয়ে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করেন। বস্তুত সকল ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মীদের মিলনমেলা হিসেবে উদ্‌যাপিত হয় সে শহর কলকাতাই হোক বা গঞ্জ শহরই হোক।□

যুব সমাজের কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা

স্বামীজী বলছেন, 'আমি এমন মানুষ চাই যাদের মাংসপেশী লোহা দিয়ে তৈরি, স্নায়ুগুলি ইস্পাত দিয়ে তৈরি আর এই দেহের মধ্যে এমন মন থাকবে যা বজ্রের উপাদানে গঠিত।'

কল্যাণ গৌতম

বীরপূজা মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি। যুদ্ধ যেহেতু আমাদের জীবনে সর্বত্রই করতে হয়; যুবসমাজের প্রতিই যেহেতু মূল দায়বদ্ধতা বর্তায়, আমরা তাই মহাপুরুষদের মধ্যে যোদ্ধৃত্ব রূপ খুঁজে নিই। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তেমনই একজন যোদ্ধা। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় যে অসংখ্য যোদ্ধার প্রয়োজন, তারা উদ্দীপিত হবেন স্বামীজীর শক্তি ভাবনায়, অন্তরের অনন্ত শক্তিতে। বিবেকানন্দ মানবজাতির মৌলিক চিন্তা ভাবনার কথা বলেছেন। স্বামীজী আগুনের ভাষায় যুবকদের মধ্যে অসীম শক্তি সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। নতুন উদ্যমে হিন্দু যুবককে উদ্বুদ্ধ করেছেন, আত্ম-চেতনা জাগিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'তোমার মধ্যে অসীম শক্তি, তুমিই আনন্দময়।' বলেছেন এগিয়ে যাবার কথা, 'Arise, awake and stop not till the goal is reached.' বলেছেন, শক্তিই জীবন এবং শক্তির শুভ প্রয়োগই ধর্ম।

নরেনের মধ্যে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণেরই শিক্ষার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। তিনি তাঁর আদরের নরেন সম্পর্কে বলেছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দিবে/যখন ঘরে বাহিরে হাঁক দেবে।' নরেন কোথায় 'শিক্ষে দিবে'? 'ঘরে' বলতে ভারতবর্ষে, 'বাহিরে' বলতে ভারত-বহির্ভূত দেশে। কীভাবে 'শিক্ষে দিবে'? 'হাঁক' দিয়ে, হুংকার দিয়ে, উদাত্ত আহ্বান করে। উদ্বুদ্ধ করবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যকে। নরেন কীভাবে শিক্ষা দিয়েছেন? নিজে আচরণ করে সেই শিক্ষা দিয়েছেন; যাকে স্বামীজী নিজেই বলেছেন, 'প্র্যাক্টিকাল বেদান্ত'। 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'।

আমরা যখন কোনো মহাপুরুষের কথা বলবো, তখন এটা দেখবো যে, দেশ ও জাতি গঠনে তিনি কত সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য পালন করেছেন। যে ব্যক্তির কর্তব্যনিষ্ঠা যত বেশি গভীর, তিনি তত বড়ো মহাপুরুষ। এই কর্তব্যবোধ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একেবারে কেন্দ্রীভূত হয় একটি পরিজন বা পরিবারকে কেন্দ্র করে। মহৎ মানুষ যাঁরা হন, যাঁরা সমাজ ও সংসারে মহাপুরুষ হিসেবে স্বীকৃত হন, তাঁদের কর্তব্যবোধের মধ্যে একটা বিশালত্ব থাকে। সমগ্র মানব জাতির উন্নতির জন্যই সেই কর্তব্যবোধ চালিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ এক্ষেত্রে সমকালের নিরিখে এবং সর্বকালের প্রেক্ষিতে এক অনন্য অসাধারণ নাম। যেমন স্বামীজী নারীর উন্নতির কথা ভেবেছেন— বারবার তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন; নারীর আদর্শের কথাও শুনিয়েছেন, 'হে ভারত, ভুলিয়ো না তোমার নারী জাতির আদর্শ।' সমকালে দাঁড়িয়ে ইউরোপীয় মহাপুরুষের এটা বলার প্রয়োজন ছিল না, তাঁরা বলেনওনি। কিন্তু ভারতের প্রেক্ষাপট তখন আলাদা। নবজাগরণের পর্ব। এবং তার অন্যতম প্রয়োজন নারীমুক্তি। ভারতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, তাই স্বামীজী এই কর্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাকে বালিকা বিদ্যালয় গঠনের উপদেশ দিয়েছেন। একেই বলে সামাজিকভাবে চালিত হওয়া। এই শিক্ষা স্বামীজীর সবচাইতে বড়ো শিক্ষা। অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

> **স্বামীজী বলছেন, ভারতবর্ষের যে রাষ্ট্রীয় সৌধ, ভারত রাষ্ট্রের যে মেরুদণ্ড তার আত্মা রয়েছে ধর্মে। ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবন নিহিত আছে হিন্দুধর্মে। রাক্ষসীর প্রাণপাখির মতো ভারতবর্ষের ধর্ম-রূপ প্রাণ-পাখিকে বিনাশ করা যায়নি বলেই এত সয়েও এ জাতটা বেঁচে আছে।**

স্বামীজীকে দেখা গেছে গভীর-গহন তত্ত্বের শিক্ষা দিতে; মিশনের মাধ্যমে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের শিক্ষা দিতে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদের তীব্র প্রতিবাদ করে, প্রাচ্যের 'পেটের চিন্তা' দূর করতে তাঁর হাঁক। এ পথে যেতে হলে ঐশী অবগাহন জরুরি— 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।' সে সময় ভারতের যুব-সমাজের কৃচ্ছ্রসাধনেরও প্রয়োজন ছিল। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতের অন্তরাত্মাকে চিনতে, জানতে চেয়েছিলেন, গোটা ভারতের দর্শনকে বুঝতে চেয়েছিলেন। পরিব্রাজনের নামে এই যে কৃচ্ছ্রসাধন, তা যুব সম্প্রদায়ের প্রতিও এক উজ্জ্বল শিক্ষার নিদর্শন যা নিজের জীবন, আচরণ দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার শিক্ষা। কোন লক্ষ্যে যাত্রা করবেন তার জন্যই তৈরি

ফ : ২

হলো মিশন, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন।

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হলো, সংবিৎ-গৃহ। জ্ঞানের বসতবাড়ি হলো আমাদের অন্তর, আমাদের ভেতরের প্রকোষ্ঠ। সেই অন্তরকে প্রকাশ করতে হবে। অন্তরবাসীকে বাইরে বোধন করতে হবে। এই বোধনের দায়িত্বটুকু পালন করবে শিক্ষাব্যবস্থা। আত্মনির্ভরশীল যুবসমাজ সেই কাজে বড়ো ভরসা। বলছেন, 'জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভর হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।' শিক্ষা বলতে শুধু তথ্য সংগ্রহ তো নয়! তথ্য সংগ্রহ আর জ্ঞানার্জন এক নয়। 'তথ্য সংগ্রহ করাই যদি জ্ঞান হয়, তাহলে লাইব্রেরির থেকে জ্ঞানী তো আর কেউ নেই।' অর্থাৎ স্বামীজী জীবনমুখী শিক্ষার অবতারণা করলেন এই মন্তব্যে। বই মুখস্থ নয়, চাকরি জোটানোর শিক্ষা নয়, কেরানি তৈরি নয়। অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশ ব্যতিরেকে শিক্ষা সম্পূর্ণ নয়। দরকার ব্রহ্মচর্য পালন। ব্রহ্মচর্য মানে বিশুদ্ধতা, শুচিতা, পবিত্রতার সাধন। ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে চরিত্রবল আসে, মনের তেজ বিকশিত হয়। তাই ব্রহ্মচর্য পালন।

অসংখ্য নেতার ভিড়ে আদর্শ নেতা, সত্য-সম্পর্কিত নেতা শনাক্তকরণ করা আজ এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। তেমনই কঠিন হলো, নিজেকে নেতৃত্বদানের যোগ্য করে তোলা। স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকে নেতা হবার মণিমাণিক্য খুঁজে বার করা যায়। ১৮৫৭ সালের মহা-আন্দোলন কেন সফলতা পেলো না, তা বলতে গিয়ে স্বামীজী এক ইংরেজ বন্ধু জেনারেল স্ট্রংয়ের উল্লেখ করেছেন। 'একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞসা করা গেল, সিপাহিদের এত তোপ বারুদ রসদ হাতে ছিল, আবার তারা সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী, তবে এমন করে হেরে মরলো কেন?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'তাদের মধ্যে যারা নেতা হয়েছিল, সেগুলো অনেক পেছনে থেকে 'মারো বাহাদুর-লড়ো বাহাদুর' করে চেঁচাচ্ছিল, অফিসার এগিয়ে মৃত্যুমুখে না গেলে কি সিপাহি লড়ে?' স্বামীজী বলছেন, নিজেই নিজেকে নেতার আসনে বসাতে নেই। ভারতে সবাই নেতা হতে চায়, অথচ হুকুম তামিল করবার কেউ নেই। আসলে লিডার জন্মান, লিডারকে বানানো যায় না, এটি বুঝতে না পারাতেই যাবতীয় বিপত্তি! সত্যিকারের লিডারি করা সহজ কাজ নয়। তাকে দাসস্য দাস হতে হয়, তাকে হাজার লোকের মন জোগাতে হয়। ঈর্ষা, স্বার্থরতা আদপে থাকবে না তার। তাকে নিঃস্বার্থ হতে হবে, যার যা প্রাপ্য তা দিতে হবে। অন্যের সামান্যতম অধিকারও পদদলিত করা চলবে না। নিখাদ ভালোবাসা ও সংযমের চরিত্র চাই। দশের হিতের জন্য নিঃশেষে 'আমিত্ব' বিসর্জন চাই। সবসময় আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হওয়া চাই।

স্বামীজীর প্রথম পরামর্শ, 'নেতা হতে যেয়ো না, সকলের সেবা করো। নেতৃত্বের এই পাশব-প্রবৃত্তি জীবনসমুদ্রে অনেক বড়ো বড়ো জাহাজ ডুবিয়েছে।' বলছেন, আদর্শ নেতারা আপন ব্যক্তিত্বের জন্যই সফল হতে পেরেছেন। নেতা যখন বলতে পারেন 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' তখনই সাফল্য লাভ হয়। নিখুঁত ও শুদ্ধচরিত্রের নেতা চাই। আপাতদৃষ্টিতে শিশুকে মনে হয় সকলের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সেই তার শৈশব-সত্তা দিয়ে গোটা বাড়ি শাসন করে। শ্রেষ্ঠ নেতার চালিকাশক্তিও হবে শিশুর মতো; সরল, পবিত্র, বাল্যগাম্ভীর্য- ভাবে মিশ্রিত, অথচ সকলের দ্বারা পরিচালিত। সকলের প্রভু তিনিই হতে পারেন, যিনি সকলের দাস। যার প্রেমে উচ্চ-নীচ নেই, কোনোরূপ অহংভাব নেই, সম্প্রদায়-বুদ্ধি নেই, তিনিই আদর্শ নেতা। নেতার সহায়ক সঙ্ঘশক্তি থাকতে হবে, যে সঙ্ঘশক্তি আজ্ঞানুবর্তিতার জন্ম দেয়। আদর্শ নেতা তিনিই, যিনি মহাশত্রুর প্রতিও সর্বদা হিতবচন প্রয়োগ করেন। নেতা সংগঠনে সমালোচনার বদলে ইতিবাচক কথা বলবেন। তার কাজ হলো, যা বলার আছে বলা এবং যা শেখানোর আছে শেখানো। ওইখানেই তার কর্তব্য শেষ। বিরুদ্ধ সমালোচনা সকল সর্বনাশের মূল।

স্বামীজীর উপলব্ধি ছিল, ভারতবর্ষে তিন জন লোকও পাঁচ মিনিট সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারেন না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রবণতা আছে, হিংসা না করার শিক্ষা নেই। ঈর্ষার অন্ত নেই। ইর্ষার জন্ম হয় কর্তৃত্বের ভাব দেখালে পরে। পদমর্যাদা যত বাড়ে, ঈর্ষাও তত বাড়তে থাকে। নেতারা সাধারণত চরিত্রবান হন না। নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে নেতার সতত প্রচেষ্টা থাকে, ব্যর্থতার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা থাকে। এসব ভালো নয়। দল ভাঙে পরস্পরকে ক্রিটিসাইজ করার জন্য। দল ভাঙে একজনের কথা আর একজনকে বলার জন্য, পরনিন্দার জন্য। স্বামীজী বলছেন, দোষ দেখা সহজ, গুণ দেখাই মহাপুরুষের কাজ। তিনি দোষ দেখে কাউকে বিচার না করার কথা বলছেন। আড়ালে অন্যের নিন্দা না করার কথা বলেছেন। সকলকে ভালোবাসাই নেতৃত্বের বড়ো লক্ষণ। একমাত্র প্রেমই পারে কর্তব্যকে মধুর করে তুলতে। নেতার উচিত তার তত্ত্বাবধানে যারা রয়েছেন তাদের সাহসী, নীতিপরায়ণ ও সহানুভূতিসম্পন্ন করে তোলা।

১৮৯৮ সালের আগস্ট মাসে স্বামীজী কাশ্মীরের জাগ্রত দেবীস্থান ক্ষীরভবানী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে দেখলেন মন্দিরের নিদারুণ ভগ্নদশা। মনে তীব্র ক্রোধ ও হতাশা জন্ম নিল, মনে মনে প্রবল বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন মন্দির ধ্বংসকারী মুসলমানদের উপর। 'যবনেরা এসে তাঁর মন্দির ধ্বংস করে গেল, তবু এখানকার লোকগুলি কিছুই করল না। আমি যদি তখন থাকতাম, তবে কখনো চুপ করে সে-দৃশ্য দেখতে পারতাম না।' পরধর্মীদের আগ্রাসনে অন্য ধর্মীয় নেতার মনে যেমন ক্রোধের উদয় হয়, তেমনই হলো স্বামীজীর। তারপরই শুনলেন সেই দৈববাণী, 'আমার ইচ্ছা আমি ভাঙা মন্দিরে বাস করব। ইচ্ছা করলে আমি কি এখনই এখানে সাততলা সোনার মন্দির তুলতে পারি না? তুই কী করতে পারিস?' তিনি মহাকালের উপর সেদিন ছেড়ে দিয়েছিলেন সমস্ত দায়ভার, তুরীয় অবস্থায় তাঁর উপর মহাশক্তি ভর করল। কিন্তু সুদূরের সলতে পাকানোর দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। লিখলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'কালী দি মাদার', যার পরতে পরতে মহাকালীর তাণ্ডব, প্রগাঢ় মানসিক অভিভবে ধ্বংসলীলা। আপন

বোধকে লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন তিনি। 'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,/কাল-নৃত্য করে উপভোগ,/মাতৃরূপা তারি কাছে আসে' —এ যেন ভয়ংকরের পুজো। মৃত্যুর পুজো, এ যে কাপুরুষের আত্মহত্যা নয়, এ যে শক্তিমানের মৃত্যু সম্ভাষণ! কবিতার মধ্যে রয়েছে তাঁর ভাব-শিষ্যদের প্রতি শক্তি- সাধনার আহ্বান। সে কাজ স্বামীজীর একলার পক্ষে তখন সম্ভব নয়। স্বামীজী তখন ক্লান্ত, অসুস্থ, সনাতন ধর্মের প্রচার ও প্রসারে জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছেন। তাই কাব্যের মোড়কে স্পষ্টই বার্তা দিলেন আগামী প্রজন্মের প্রতি। দীপ হাতে হাজির হলেন শ্রীঅরবিন্দ; লিখলেন 'ভবানী-ভারতী'। 'শ্যামা জননীর মহাপ্রসাদ' শ্যামাপ্রসাদের বলিদান হলো কাশ্মীরে। তারই ধারাবাহিকতায় স্বামীজীর ১২০ বছর বাদে আর এক নরেন্দ্র-র হাতে দীপাধার পৌঁছলো।

স্বামীজী বলছেন, 'গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে।' 'You will understand the Gita better with your biceps, your muscles, a little stronger.' বলছেন, 'আমি এমন মানুষ চাই যাদের মাংসপেশী লোহা দিয়ে তৈরি, স্নায়ুগুলি ইস্পাত দিয়ে তৈরি আর এই দেহের মধ্যে এমন মন থাকবে যা বজ্রের উপাদানে গঠিত।' এসব তো যুবশক্তির প্রতিই তাঁর আহ্বান। স্বামীজী মনে করতেন শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের এক তৃতীয়াংশ দুঃখের কারণ। আমরা যে একসঙ্গে মিলতে পারি না, পরস্পরকে ভালোবাসি না, তোতাপাখির মতো কথা বলে যাই, আচরণে পশ্চাৎপদতা দেখাই— তার আসল কারণ হলো আমরা শারীরিকভাবে দুর্বল। বেদের প্রার্থনায় তাই বলের উপাসনা, সামর্থ্যের উপাসনা, শক্তির উপাসনার কথা পাই— 'তেজেঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্যমসি বীর্য ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজি ময়ি ধেহি।' হে তেজস্বরূপ, আমায় তেজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ, আমায় বীর্যবান কর; হে বলস্বরূপ, আমায় বলবান কর! হে ওজঃস্বরূপ, আমায় ওজস্বী কর। ঋগ্বেদ সংহিতা উদ্ধৃত করে বলছেন একচিত্ত

স্বামীজীর উপলব্ধি ছিল, ভারতবর্ষে তিন জন লোকও পাঁচ মিনিট সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারেন না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রবণতা আছে, হিংসা না করার শিক্ষা নেই।

হওয়াই সমাজ গঠনের রহস্য— 'সংগচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম।'

স্বামীজী যুবশক্তিকে রাষ্ট্রের আত্মার কথাও শুনিয়েছেন। বলেছেন এই আত্মাতে যতদিন না ঘা পড়ে, ততদিন সেই রাষ্ট্রের মৃত্যু নেই। রাষ্ট্রের আত্মা যেন সাপের মাথার মণি, যেন রূপকথার জগতে রাক্ষসীর প্রাণভোমরা। যতক্ষণ রূপকথার সাপের মাথায় মণি থাকবে ততক্ষণ তাকে মারা যাবে না। যতক্ষণ রাক্ষসীর প্রাণভোমরা রূপ ক্ষুদ্রপাখির ভেতর তার প্রাণ থাকবে ততক্ষণ তাকে মারা যাবে না। সাপ বা রাক্ষসীকে মারতে হলে মাথার মণি সরাতে হবে, সেই প্রাণপাখিকে টুকরো করে কেটে ফেলতে হবে। স্বামীজী বলছেন, ভারতবর্ষের যে রাষ্ট্রীয় সৌধ, ভারত রাষ্ট্রের যে মেরুদণ্ড তার আত্মা রয়েছে ধর্মে। ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবন নিহিত আছে হিন্দুধর্মে। রাক্ষসীর প্রাণপাখির মতো ভারতবর্ষের ধর্ম-রূপ প্রাণ-পাখিকে বিনাশ করা যায়নি বলেই এত সয়েও এ জাতটা বেঁচে আছে। হাজার হাজার বছরের স্বভাব— তা মরবেই-বা কী করে? স্বামীজী ভারতবর্ষের এই জাতীয় চরিত্র বদলের কথা বলেননি। তাঁর মতে যে নদী পাহাড় থেকে হাজার ক্রোশ নেমে আসে তাকে ফের পাহাড়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। বলছেন, যে দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম সে দেশকে ধর্মের মধ্য দিয়েই সব করতে হবে। 'রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে, নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামিচিই সার...।' স্বামীজী শিক্ষা ও ধর্মকে ভিন্ন ভিন্ন করে দেখাননি। ধর্ম হচ্ছে শিক্ষার ভেতরকার সার জিনিস। শিক্ষার লক্ষ্য মানুষ গড়া, ধর্মের লক্ষ্যও তাই। ধর্ম ও শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক, বিকাশ ধারার দুই পথ।

এখন স্বামীজীকে স্মরণ করে যদি শক্তি সঞ্চার করতে না পারি, তাঁকে স্মরণ-মনন বৃথা। অধর্মের শক্তি পাশবিক আক্রমণ নামিয়ে আনে। তা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের থেকেও ভয়ংকর। রাষ্ট্রবাদী যুবশক্তিকে ভুলে গেলে চলবে না, তাকে কাজ করতে হবে ঘরে-বাইরে অসংখ্য বিরোধী শক্তির সঙ্গে। মোকাবিলায় ব্যর্থ হলে জয় অধরাই থেকে যাবে, এমনকী জয়ের সম্ভাবনা চিরতরে বিনষ্ট হতে পারে। যে রাজনৈতিক শক্তি ধর্ম-আধারিত, তাকে ধর্ম-ভিত্তিক বীরপূজা দিয়েই কর্ম সম্পাদন করে যেতে হয়। শক্তি সাধনাই সেখানে একমাত্র পথ। 'ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধর্ম করা', আর ধর্ম জয়ের পথে অমিত শক্তির ব্যবহার করাই গীতার বাণী। আমরা যুবশক্তি স্বামীজীর জীবনীপাঠ করে ধর্মের জন্য শুভঙ্করী শক্তি প্রয়োগ করবো। আমরা যোদ্ধা হবো, আমরা বীরপূজা করবো। ভারতবর্ষ যেমন সন্তভূমি, ভারতবর্ষ বীরভূমিও বটে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শক্তির ও ধর্মের শুভ প্রয়োগ ঘটাবো আমরা। দৈনিক শরীরচর্চা করবো, লাঠিখেলা, ক্যারাটে, কুস্তি, মার্শাল আর্ট শিখবো, শিখবো রকমারি রণকৌশল। হিন্দু নামে আমরা গর্ব অনুভব করবো, করাবো। তবেই বিবেক-শুভ্র বিবেকানন্দের জন্মদিন, প্রয়াণ দিন, শিকাগো বক্তৃতার দিন পালন করা সার্থক হবে। ❑

With Best Compliments from :

A
Well Wisher

স্বামীজীর ভাবনায় নারীশিক্ষা

সন্দীপা বসু

বাগবাজার নিবেদিতা গার্লস স্কুল

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, একটি ডানায় ভর করে যেমন পাখি উড়তে পারে না, তেমনই নারীর উন্নতি না হলে জগতের কল্যাণ সম্ভব নয়। নারী শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজীর ভাবনার কথা আলোচনা করার সময় মনে রাখা প্রয়োজন স্বামীজী যে সময় দাঁড়িয়ে নারীদের কথা বলেছেন, সেই সময় ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার কোনো গুরুত্ব ছিল না। মনে করা হতো সংসারে নারীর ভূমিকা কেবলমাত্র গৃহকর্ম সম্পাদন ও সন্তান উৎপাদন। অথচ চিরকাল এমন ছিল না। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে বহু নারী ছিলেন ঋষি ও মন্ত্রদ্রষ্টা। দেবী সূক্ত রচয়িতা ঋষি বাক ছিলেন নারী। পরবর্তীতে আমরা পাই মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ঋষিস্থানীয়া মনীষিণীদের। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই কালে ব্রহ্মবাদিনীর সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। সমাজে সর্বোচ্চ স্থান ছিল তাঁদের। সে যুগে নারীর দুরবস্থা বা অমর্যাদার কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থর আসল রূপ এমনই। এই ভারতবর্ষই জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতায় সমগ্র বিশ্বকে পথপ্রদর্শন করত। এই বিষয়টি লক্ষ্য রেখে স্বামীজী বলেছিলেন, যেদিন থেকে নারীদের বেদ পাঠে অনধিকারী বলে দূরে সরিয়ে দেওয়া হলো, সেদিন থেকেই ভারতবর্ষের অধঃপতন শুরু হলো। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন— যে সমাজে নারীর যোগ্য সম্মান নেই, সে সমাজ কখনই অগ্রসর হতে পারে না। যেহেতু একটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা তার মায়ের কাছেই সম্পন্ন হয়, তাই মা সুশিক্ষিত না হলে সন্তানের শিক্ষাও সম্পূর্ণ হতে পারে না। স্বভাবতই আগামীদিনে শক্তিশালী, শিক্ষিত ও উন্নত দেশ গঠনের জন্য দেশের নারীদের সুশিক্ষিত করা প্রয়োজন বলে মনে করতেন তিনি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে অন্ধকারে নিমজ্জিত ভারতীয় নারী প্রথম মুক্তির বার্তা পায়। সতীদাহ প্রথাকে বেআইনি ঘোষণা করা ও বিধবাবিবাহের পক্ষে আইন প্রণয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে সমাজে সংস্কারের জোয়ার আসে। তাঁর মধ্যে নারীশিক্ষার বিষয়টিও ছিল। স্বামীজী কিন্তু সেই সময় তাঁর সমসাময়িক সমাজ সংস্কারদের থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে ভেবেছিলেন। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক সংস্কারের পথে না হেঁটে নারীর সামগ্রিক উন্নতির কথা বলেছিলেন তিনি। নারীর পূর্ণস্বাধীনতার কথা সর্ব প্রথম তিনিই বলেন, যা তাঁর সমসাময়িক অন্যকারও মুখেই শোনা যায়নি। তিনি বলেছিলেন, ‘তোমরা নারীদের শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাঁহারাই বলিবে কোন জাতীয় সংস্কার তাঁহাদের পক্ষে আবশ্যক।’ অর্থাৎ পুরুষের দ্বারা সাজিয়ে হাতে তুলে দেওয়া নারী মুক্তি নয়, তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় নারীরা যথার্থ অর্থেই শিক্ষিত ও স্বাধীন হয়ে উঠুক। নিজেদের মুক্তি তারা নিজেরাই খুঁজে নিক।

নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে আজও স্বামীজীর ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। একমাত্র তাঁর প্রদর্শিত পথেই নারীর সার্বিক শিক্ষা ও মুক্তি সম্ভব।

ঊনবিংশ শতকে বিদেশি শাসনকালে ভারতে নারী শিক্ষার প্রবর্তন হয়। দীর্ঘ বিদেশি শাসনে অভ্যস্ত ভারতবর্ষ ততদিনে তার নিজ শিক্ষা পদ্ধতি, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, সর্বোপরি তার নিজস্ব গৌরবময় অতীত— সব কিছুই বিস্মৃত হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু এই শিক্ষা ছিল

ভারতীয় দর্শন, মূল্যবোধ এবং জীবনযাত্রার থেকে ভিন্নধর্মী। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এক অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। কিছু মানুষ এই শিক্ষা সঠিক ভাবে গ্রহণ করতে না পেরে ভুল পথে পরিচালিত হয়, ভুল আচরণে লিপ্ত হয়। শিক্ষার মূল ভাবটি গ্রহণের থেকে বেশি প্রকট হয়ে ওঠে অন্ধ অনুকরণ।

স্বামীজীর চোখে এই বিষয়টি ধরা পড়েছিল। আর সেই কারণেই তিনি চেয়েছিলেন এদেশে শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হোক আধ্যাত্মিকতা। বিদেশের, বিশেষত আমেরিকান মহিলাদের বিপুল কর্মশক্তি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি মনে করতেন ওই বিপুল কর্মশক্তির সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সঠিক সমন্বয়ে নারী জাতির সম্পূর্ণ এবং যথাযথ অভ্যুদয় সম্ভব।

এছাড়াও প্রথাগত সমস্ত শিক্ষার পাশাপাশি নারীকে ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার ওপর জোর দিয়েছিলেন তিনি। এমন শিক্ষা, যার মাধ্যমে তাঁরা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারবেন। নারী স্বনির্ভর হলেই নারী ও পুরুষে বিভেদ কমবে বলে বিশ্বাস করতেন তিনি।

এই পদ্ধতিতে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য বেলুড়মঠের উলটোদিকে আর একটি মঠের পরিকল্পনা করেছিলেন স্বামীজী। যেমন ভাবে বেলুড়মঠের কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরাজমান, তেমনই এই মঠের কেন্দ্রে বিরাজমান থাকবেন মা সারদা। তাঁর আদর্শকে ভিত্তি করেই এখানে নারী শিক্ষা এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্ম চলবে, এমনই পরিকল্পনা ছিল স্বামীজীর। এই মঠে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার পরিকল্পনাও ছিল বলে জানা যায়, যেখানে একইসঙ্গে সমস্ত রকম শাস্ত্র, সংগীত, ব্যাকরণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মশিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ওপর জোর দেওয়া হবে। এই মঠের সমস্তরকম প্রশাসনিক কাজকর্ম ও পরিচালনা সম্পূর্ণ ভাবেই মহিলাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তিনি চেয়েছিলেন কিছু শিক্ষিত নারী আজীবন ব্রহ্মচারিণী থেকে দেশের নারী শিক্ষা এবং নারীর উন্নতিকল্পে কাজ করবে। তাঁর সে স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু তাঁরই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর বাগবাজারে স্থাপিত হয় রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, স্বামীজী মুখস্থ বিদ্যার থেকে বেশি জোর দিয়েছেন এমন শিক্ষার ওপর যা নারী-পুরুষ উভয়েরই মনন ও জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন বয়ে আনে। তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, স্বনির্ভর করে তোলে। তিনি মনে করতেন শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মানুসন্ধান ও আত্ম-আবিষ্কার এবং চিন্তা, বোধ ও মননের স্বাধীনতা, ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা। যথার্থ শিক্ষিত না হলে নিজে চিন্তা করার ক্ষমতা জন্মায় না। শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হলো স্বাধীন চিন্তা শক্তির বিকাশ। যথার্থ অর্থেই নারীদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, 'মেয়েদের বিষয়ে পুরুষের হস্তক্ষেপের অধিকার তাঁদের শিক্ষা পর্যন্ত।' তিনি মনে করতেন নারীদের এমন যোগ্যতা অর্জন করতে হবে যে তাঁদের সমস্যা তাঁরা নিজেদের মতো করে সমাধান করতে সমর্থ হবেন। আগামীদিনে শিক্ষিতা নারী হবেন পবিত্রতা, শক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক। এমনটাই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

বর্তমানে পরিস্থিতি বদলেছে অনেকটাই। এখন নারীরা কোনো ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। এই প্রভূত অগ্রগতি সত্ত্বেও, আজও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বামীজীর কাঙ্ক্ষিত সেই সার্বিক শিক্ষার অভাব অনুভূত হয়। আজও প্রতিনিয়ত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে চলে নারীর ওপর অত্যাচার, নৃশংসতা। আজও বহু জায়গায় কন্যাসন্তান অবাঞ্ছিত, কানে আসে কন্যাভ্রূণ হত্যার খবর।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই ঘটনাগুলির পেছনে প্রায়শই এক শ্রেণীর পুরুষের পাশাপাশি নারীরও ভূমিকা থাকে। আজও নারীর সুরক্ষায় সরকারকে আইন তৈরি করতে হয়। কেন? মূল কারণ, আজও দেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে স্বাধীন ও শুভ চিন্তার উদয় ঘটেনি। সেই শিক্ষা কোথায় যা প্রকৃত আলোর দিকে নিয়ে যাবে, স্বাধীন ও সুস্থচিন্তার বিকাশ ঘটাবে? বাহ্যিক পরিবর্তন যতই হোক না কেন, সত্যই কি আমরা কোথাও এগোতে পেরেছি? সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে আজ সমাজে নারী-পুরুষের সমমর্যাদা হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ওপরের খোলস বদলেছে কেবল, ভেতরে কোনো বদল হয়নি। কতিপয় সফল নারী কখনই একটি সমাজের পূর্ণচিত্র তুলে ধরে না। যতদিন না সমাজের প্রান্তিক নারীরা শিক্ষিত হচ্ছে, ততদিন সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। ততদিন সমাজে নারীদের এই দুরবস্থা বদল হওয়া সম্ভব নয়। এখানেই শিক্ষার গুরুত্ব। একমাত্র শিক্ষাই পারে সমাজের এই অন্ধকার দূর করতে, নারীকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে।

তাই, এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে আজও স্বামীজীর ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। একমাত্র তাঁর প্রদর্শিত পথেই নারীর সার্বিক শিক্ষা ও মুক্তি সম্ভব। আমরা আশা করতে পারি শীঘ্রই এমন দিন আসবে যেদিন স্বামীজীকে, তাঁর আদর্শকে মানুষ আরও বেশি করে বুঝবে, বেশি করে জানবে। তাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে সমগ্র সমাজ। ফিরে আসবে তার হৃতগৌরব। তখনই স্বামীজীর স্বপ্নের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটবে। ◘

স্বামীজী চেয়েছিলেন ভারত হোক আধ্যাত্মিক রাষ্ট্র

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সনাতন হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা বিজয়দর্পে যিনি উড্ডীন করেছিলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর বাণী, তাঁর চিন্তা-ভাবনা, তাঁর নির্দেশাবলী অনুসরণে আগামীদিনে ভারত আধ্যাত্মিকতাকে হাতিয়ার করে সারা বিশ্বে চালকের আসনে প্রতিষ্ঠিত হোক।

রামানুজ গোস্বামী

স্বামীজীর রচনাবলী গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, বহু ক্ষেত্রে বারে বারে তিনি দেশ তথা সমাজের প্রকৃত কল্যাণের জন্য প্রাচীন আর্যধর্ম তথা হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য ও পরম্পরায় প্রচারের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অথচ এই সকল ব্যাপারে স্বামীজী যেন কখনও কিছুই বলেননি, এমন একটা ভাবধারা প্রচার করা হয়েছে। বস্তুত, স্বামীজীর বাণী ও রচনা পড়লে এটা বোঝাই যায় যে, হিন্দুদের তিনি কীভাবে হিন্দুত্ববাদী ভাবনা ও ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসারে উৎসাহিত করেছেন। বারে বারে তাঁর কথায় বা লেখায় এটাই উঠে এসেছে যে, এই দেশের প্রাণকেন্দ্রই হলো ধর্ম এবং তা অবশ্যই সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্ম। তাই অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নতি পরে হলেও চলবে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি বা ধর্মীয় উন্নতি সর্বাগ্রে দরকার। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর রচনাবলী থেকেই উদ্ধৃত করা যায়--- 'তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্যজাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিনপুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ডই ভাঙিয়া যাইবে— যে ভিত্তির উপর সুবিশাল জাতীয় সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙিয়া যাইবে; ফল দাঁড়াইবে— সম্পূর্ণ ধ্বংস।' (স্বামীজীর বাণী ও রচনা : ৫/৪৬)

সুতরাং এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কীভাবে হিন্দুদের ধর্মরক্ষায় উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী। হিন্দুরা যাতে নিজেদের গৌরবময় অতীত, ঐতিহ্য, হিন্দু সম্রাটদের শাসনকালের বিস্তারিত বিবরণ,

হিন্দুধর্ম কীভাবে সারা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করেছিল, ভারতের প্রাচীন মুনি-ঋষিরা কীভাবে পরমের উপলব্ধিতে সমর্থ হয়েছিলেন, বেদ-উপনিষদের মূল বক্তব্যই-বা কী— এইসব নানা ব্যাপারে আগ্রহী হয় এবং যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল ভাবে প্রচার চালানো যায়, হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে যাতে এই সব ব্যাপারে গড়ে ওঠে জনভিত্তি, স্বামীজী সেটাই চেয়েছিলেন। তাই তাঁর বক্তব্য এই ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য— 'আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলনভূমি, ওই ভিত্তিতে আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ভাবী ভারত গঠনে হিন্দুধর্মের ঐক্যসাধন অনিবার্য রূপে প্রয়োজন' (৫/১৮৩)।

তিনি বলেছেন 'প্রথমেই আমাদিগকে এই কাজে মন দিতে হইবে যে, আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল অপূর্ব সত্য নিহিত আছে সেগুলি ওই সকল গ্রন্থ হইতে, মঠ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায় বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইতে হইবে, যেন ওই সকল শাস্ত্রনিহিত সত্য আগুনের মতো উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সারাদেশে ছুটিতে থাকে।' (৫/১১১)

স্বামীজীর মতে— 'আমাদিগকে দেখিতে হইবে কীরূপে এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক জাতির গার্হস্থ্য জীবনে কার্যে পরিণত করিতে পারা যায়। (২/২২৯)

স্বামী বিবেকানন্দ এটাই চেয়েছিলেন যে, ভারতবাসী বর্ণাশ্রম ধর্মের আদর্শকে অনুসরণ করে প্রাচীন ঋষিদের প্রদর্শিত পথ ধরেই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাক। তিনি এই বৈদান্তিকতার প্রচারে যুবসমাজকে বিশেষ ভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। হিন্দু যুবকেরা দেশে বিদেশে সর্বত্র বেদান্ত প্রচার করুক, এটাই ছিল তাঁর ভাবনা। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন স্বামীজী। বস্তুত, নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ যে হিন্দু সমাজের বিপত্তির একটা খুব বড়ো কারণ, এটা স্বামীজী বারে বারেই উল্লেখ করেছেন। এই ব্যাপারে তিনি সঙ্ঘ-স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন যা হিন্দুদের নানা সম্প্রদায়ের পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা ও মতামত আদান-প্রদানে শিক্ষা প্রদান করবে।

বর্তমানকালে অনেক শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক ভারতীয় ধারায় শিক্ষাদানের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এই ব্যাপারেও যুগদ্রষ্টা স্বামীজীর উক্তি স্মরণীয়। স্বামীজী বলেছেন,

'আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে, আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিক চিন্তার দ্বারা আমাদিগকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে, এছাড়া আর গত্যন্তর নাই। ...জাতীয় জীবনকে— যে জাতীয় জীবন একদিন সতেজ ছিল তাহাকে পুনরায় সতেজ করিতে গেলে ভারতীয় চিন্তারাশি দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে হইবে' (৫/১৭২)।

বলাই বাহুল্য যে, বিবেকানন্দের ভাবনায় হিন্দু আদর্শ, ঐতিহ্য ও পরম্পরার বিস্তার ও বিকাশ এবং গুরুকুল প্রথাই প্রকৃত মানুষ গঠন করতে পারে। তাই তিনি আবারও নতুন করে ওই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থারই পত্তন করতে চেয়েছিলেন।

এটা ঠিক যে, স্বামীজী অবশ্যই পাশ্চাত্যের আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে গ্রহণ করার কথা বলেছেন--- তবে তা অবশ্যই ভারতের সনাতন ধর্মীয় আদর্শকে বাদ দিয়ে নয়। ধর্মই যে সমাজের ভিত্তি, তা যে স্বামীজী কতবার কতভাবে কতস্থানে বলেছেন, তার ইয়ত্তা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে দুটি উক্তির কথা অবশ্যই বলা দরকার— 'ভারত চিরকাল মাথায় জুতো বইবে, যদি ত্যাগী সন্ন্যাসীদের হাতে আবার ভারতকে বিদ্যা শেখাবার ভার না পড়ে' (৯/৪০৪)।

'ছোটো ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত কেতাব এখানে নেই। ...রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছোটো ছোটো গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায় কতকগুলি বাংলাতে আর কতকগুলি ইংরেজিতে কেতাব করা চাই। সেইগুলি ছোটো ছেলেদের পড়াতে হবে' (৯/৪০৫)।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তথাকথিত কিছু মানুষ যখন নানাবিধ অশালীন মন্তব্য করে হিন্দু সন্ন্যাসী ও হিন্দু পৌরাণিক চরিত্র সম্পর্কে, তখন সেইসব উক্তির বিরুদ্ধে স্বামীজীর এই সকল মন্তব্য যেন এক একটি নির্মম কশাঘাত। হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকেও যারা হিন্দুধর্মের অপমান করে চলেছে প্রতিনিয়ত এবং জয়গান করছে বিধর্মীদের, সেই সব বিশ্বাসঘাতক ও ধান্দাজীবীদের ঘৃণা করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি অন্য ধর্মকে ঘৃণা করবার কথা বলেননি, কিন্তু যারা সনাতন হিন্দুধর্মকে অপমান করবার কথা ভেবেছে বা করেছে--- তাদের বিরুদ্ধে সদাসর্বদাই খড়্গহস্ত হয়েছেন। তাঁর একটি উক্তি এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য— 'নৈতিক আদর্শের দিক দিয়া হিন্দুরা অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা প্রভূত উন্নত' (১০/৩৪)।

'যদি বিভিন্ন দেশের ইতিহাস তুলনা করা যায় তবে দেখা যাইবে, এই সহিষ্ণু নিরীহ হিন্দুজাতির নিকট পৃথিবী যতটা ঋণী, আর কোনো জাতিরই নিকট ততটা নহে। হিন্দুগণ চিরকালই ঈশ্বরের মহিমান্বিত সন্তান। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে কেবল আমরাই কখনও অপর জাতিকে যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা জয় করি নাই' (৫/৪)।

'হিন্দুদিগের সকল দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাহারা নৈতিক চরিত্রে ও আধ্যাত্মিকতায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বহু ঊর্ধ্বে' (৬/৪৯৬)।

'জগতে যত জাতি আছে, তাহার মধ্যে হিন্দুই সর্বাপেক্ষা পরধর্মসহিষ্ণু। ভারতে মুসলমানেরাই প্রথমে পরধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল' (৯/৪৪৭)।

'সনাতন হিন্দুধর্মের জয় হোক। মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডেরা পরাভূত হোক্। ওঠ বৎসগণ, আমরা নিশ্চিত জয়লাভ ক'রব' (৬/৪১৯)।

'মিশনারিরা ভারতে গিয়া শুধু দুইটি কাজ করেন--- যথা দেশবাসীর পবিত্রতম বিশ্বাসসমূহের নিন্দা করা এবং জনগণের নীতি ও ধর্মবোধকে শিথিল করিয়া দেওয়া' (১০/১৫)।

'তোমরা কতকগুলি মানুষকে শিক্ষিত কর, খেতে দাও, পরতে দাও, মাইনে দাও— কী কাজের জন্য? তারা আমার দেশে এসে আমার পূর্বপুরুষদের অভিসম্পাত করে, আমার ধর্মকে গাল দেয়, আমার দেশের সব কিছুকে মন্দ বলে। তারা মন্দিরের ধার দিয়ে যেতে যেতে বলে, এই পৌত্তলিকের দল, তোরা নরকে যাবি। তারা কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতে সাহস করে না, জানে, এখুনি খাপ থেকে তলোয়ার বেরিয়ে পড়বে (৫/৪১৬)।

'হিন্দুধর্ম কখনও অপর ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করে নাই। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ই প্রেম ও শান্তিতে বাস করিতে পারে। মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ধর্মান্ধীয় মতামত লইয়া হত্যা অত্যাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা আসিবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল' (৯/৪৩৯)।

'খ্রিস্টানধর্ম চিরকালই তরবারির বলে প্রথাগত হয়েছে' (৪/২৫০)।

'এখন লক্ষণীয় যে, মুসলমানরা এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। তাঁহাদের মূল মন্ত্র আল্লা এক এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে; যে কোনো পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে; যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; যে কোনো গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচারিত হইয়াছে সেগুলি দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম' (Complete Works, Eng. Vol-IV P-125-126)।

স্বামীজী স্পষ্ট ভাষায় এই বলে আমাদের সতর্ক করেছেন যে, 'মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা কত বেশি হিন্দুর বসবাস ছিল, আজ তাহাদের সংখ্যা কত হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কোনো প্রতিকার না হইলে হিন্দু দিন দিন আরও কমিয়া যাইবে, শেষে আর কেহ হিন্দু থাকিবে না' (৫/৩৪০)।

স্বামীজী আরও বলেছেন যে, 'শত শত বৎসর ধরিয়া 'আল্লা হো আকবর' বলে ভারতগগন মুখরিত হইয়াছে এবং এমন হিন্দু কেহ ছিল না যে, প্রতিমুহূর্তে নিজের জীবন বিনাশ আশঙ্কা না করিয়াছে' (৫/২৭১)।

বস্তুত, ইসলাম যে মোটেও কোনো শান্তির ধর্ম নয় এবং অন্য ধর্মের ব্যক্তিকে চিরতরে নির্মূল করাই যে সেই ধর্মের মূলকথা, তা স্বামীজীও স্বীকার করেছেন। খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রেও তিনি একই কথা বলেছেন। এই

ক্ষেত্রেই হিন্দুধর্ম অনন্য, শ্রেষ্ঠ। তাই যে সকল ব্যক্তির মতে, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ, কারণ এই দেশে সব ধর্মের লোকেরাই মিলেমিশে থাকে, বলাই বাহুল্য যে এই মতবাদ সর্বৈব মিথ্যা। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ কারণ এই দেশে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেদিন হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে না, সেইদিন ভারত আর ভারত থাকবে না। স্বামীজী একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের অধিবাসীরা চিরকালই ছিল হিন্দু। গায়ের জোরে, তলোয়ারের বা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে কিংবা সুকৌশলে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের একটা অংশকে মুসলমান বা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। তাই এরা যদি পরবর্তীকালে আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে চায়, তবে অবশ্যই তার ব্যবস্থা করা উচিত।

মুসলমান বা খ্রিস্টানরা যে বিদেশ থেকে ভারতে এসেছিল, একথা তো সর্বজনবিদিত। কিন্তু আর্যরা? পাশ্চাত্যের হিন্দুধর্মবিদ্বেষী পণ্ডিতেরা এবং তাদের অর্থে সম্পদশালী হয়ে ওঠা ভারতীয় ধান্দাবাজ ব্যক্তিরা এই কথাই বলে যে, আর্যরা ভারতের আদি বাসিন্দা নয়। আর্যরা বহিরাগত এবং এদেশের আদি অধিবাসীদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের পরাজিত করে তবেই তা ভারত দখল করতে সমর্থ হয়েছে। এমনকী এই হিন্দুধর্মবিরোধীরা ভগবান রামচন্দ্রকে অত্যাচারী, পররাজ্যলোভী, অনার্যদের উপরে যারপরনাই শোষণকারী ইত্যাদি বলে থাকে। ভারতবর্ষের বিদ্যালয়ের একেবারে নিম্নস্তর থেকে এইসব শেখানোও হয়ে থাকে। বলাই বাহুল্য যে, এই সবই আসলে হিন্দুত্বের জাগরণ যাতে না ঘটতে পারে, তার জন্য এক সুপরিকল্পিত প্রয়াস। এই ব্যাপারে স্বামীজী চরম ক্রোধ প্রকাশ করে বলেছেন যে, 'ওই যে ইউরোপী পণ্ডিত বলছেন যে, আর্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতে বুনোদের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন ওসব আহাম্মকের কথা। আমাদের পণ্ডিতেরাও দেখছি। সে গোঁয়ে গোঁ— আবার ওইসব বিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শোনানো হচ্ছে। এ অতি অন্যায়' (৬/২০৯)।

'কোন বেদে, কোন সূক্তে, কোথায় দেখছ যে আর্যরা বিদেশ থেকে এদেশে এসেছেন? কোথায় পাচ্ছ যে তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কী? আর রামায়ণ তো পড়া হয়নি, খামকা এক বৃহৎ গল্প রামায়ণের উপর কেন বানাচ্ছো?' (৬/২১০)।

'রামায়ণ কিনা আর্যদের দক্ষিণী বুনো-বিজয়! বটে, রামচন্দ্র আর্য রাজা, সুসভ্য, লড়ছেন কার সঙ্গে? লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড়ো কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশি ছিল বরং কম তো নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক মিলিত হলো কোথায়? তারা হলো সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন গুহকের, কোন বালি রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন। তা বলো না?' (৬/২১০)

'ইউরোপের উদ্দেশ্য— সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকবো। আর্যদের উদ্দেশ্য সকলকে আমাদের সমান করব, আমাদের চেয়ে বড়ো করব। ইউরোপের সভ্যতার উপায়--- তলোওয়ার; আর্যের উপায় বর্ণবিভাগ। শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শেখবার সোপান বর্ণবিভাগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য' (৬/২১১)।

কেউ কেউ বলেন, স্বামীজী 'হিন্দু'-শব্দের তেমন একটা প্রয়োগ করেননি। তিনি বৈদান্তিক শব্দের বেশি প্রয়োগ করতেন। এটাও একটা হিন্দু-বিরোধী ষড়যন্ত্র। হিন্দুধর্ম ও বেদ-বেদান্ত যে সমার্থক, একথা স্বামীজী বারে বারেই বলতেন। তাঁর কথা— 'বেদের ধর্মই হিন্দুদিগের ধর্ম' (৩/৩৬৮)।

তিনি আরও বলেছেন যে— 'বেদের পরে জগতের যে কোনো স্থানে যে কোনো ধর্মভাবের আবির্ভাব হয়েছে, তা বেদ থেকে নেওয়া বুঝতে হবে।' (৯/৪৮৭)

'ভারতের সকল সম্প্রদায়— দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী অথবা সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব, বৈষ্ণব যে কেহ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহে, তাহাকেই বেদের এই উপনিষদ ভাগকে মানিয়া চলিতে হইবে' (৫/১৬)।

'হিন্দুধর্ম-আক্রমণকারী অজ্ঞ সমালোচকগণের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও এখনও শ্রুতিই হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ড স্বরূপ' (৫/৪৪৭)।

হিন্দুত্ব প্রসঙ্গে কারও কারও অভিমত এটাই যে, কেন সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাসচর্চা ইত্যাদি সব কিছুই ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে। এটা তো উচিত নয়। এই ব্যাপারেও স্বামীজী ভিন্নমত পোষণ করতেন। যারা এই কথাই প্রচার করে যে, স্বামীজী সেবা করবার কথা ছাড়া আর কিছুই বলেননি, তারা মিথ্যা কথা বলে। সব কিছুই হোক ধর্মের মাধ্যমে, এটাই ছিল তাঁর অভিমত। সবার আগে চাই আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে হিন্দুদের পুনর্জাগরণ ও সংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ সমাজ। তবেই হবে ভারতের প্রকৃত উন্নতি। ভারত হিন্দুধর্মের ধ্বজা উড্ডীয়মান করেই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে, স্বামীজী এটাই চেয়েছিলেন। এদিক থেকে দেখলে তাই বলা যেতেই পারে যে, ভারত এক আধ্যাত্মিকরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠুক, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশ। স্বামীজীর মতে— 'আমরা হিন্দু, আমি এই হিন্দু শব্দটি কোনো মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না; আর যাহারা মনে করে, ইহার কোনো মন্দ অর্থ আছে, তাহাদের সহিত আমার মতের মিল নাই' (৫/২৬৯)।

'এখানে ধর্ম ও হিন্দু— এই দুইটি শব্দ একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ...অসভ্য জাতিসমূহ তরবারি ও বন্দুক লইয়া বর্বর ধর্মসমূহ আমদানি করিয়াছে...' (৫/২৭২)।

স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুত্ববাদী ভাবনাকে কোনো একটামাত্র সীমিত প্রবন্ধে আলোচনা করা একেবারেই সম্ভব নয়। তাই, এই প্রবন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সামান্য প্রয়াসমাত্র করা হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সনাতন হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা বিজয়দর্পে যিনি উড্ডীন করেছিলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর বাণী, তাঁর চিন্তা-ভাবনা, তাঁর নির্দেশাবলী অনুসরণে আগামীদিনে ভারত আধ্যাত্মিকতাকে হাতিয়ার করে সারা বিশ্বে চালকের আসনে প্রতিষ্ঠিত হোক, এটাই প্রার্থনা।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং গবেষক)

মমতার বাঙ্গালি প্রীতি শুধুই ছলনা

স্বস্তিকা পত্রিকায় গত ১৩ ডিসেম্বর লেখক ‘রাজ্যপাট’ কলামে মমতার ইতিহাস অবলুপ্তির প্রসঙ্গ তুলেছেন। অবশ্যই এটি সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সূত্রে বলি, মমতা সামগ্রিকভাবে ইতিহাস আদৌ মুছতে চাইছেন না। ২০১১ সালে সিপিএমের (বামফ্রন্টের বকলমে) একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে অবশ্যই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততায় ও তাঁর আবেগময় নেতৃত্বের গুণে অপসারণ করেছিলেন। বাঙ্গলার হাজার বছরের রাইখ (হিটলার) বা চিরস্থায়ী ভাবে একই কমিউনিস্ট নেতার বা দলের নেতৃত্বে অতি দীর্ঘস্থায়ী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন থেকে মুক্ত করার কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য। ওখানেই ইতি। ক্ষমতায় এসেই তিনি ওই দুটি শাসন প্রণালীর অন্ধ অনুকরণ তো করলেনই সঙ্গে বাড়তি যোগ করলেন পারিবারিক শাসন প্রতিষ্ঠা। সারা ভারত থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি গণতন্ত্রের পক্ষে এই লজ্জাকর দিকটি চয়ন করেছেন। তাতে কুছ পরোয়া নেই। তিনি হুইল চেয়ারের নবতীপর দাক্ষিণাত্যের করুণানিধি ও দেবেগৌড়াকে মনে রেখেছেন। উত্তরের ঝুটা গান্ধী পরিবার, মুলায়ম রাজবংশ তাঁর প্রেরণার স্থল। আর রাজ্যের লাগোয়া পুবের বিহার থেকে তিনি কীর্তিমান লালুপ্রসাদের অনুরাগী। পশ্চিমের পরিবারবিদ শরদ পাওয়ারের সঙ্গে তিনি অতি সম্প্রতি দেখা করে—রাজনীতির কৌশল ঠিক করছিলেন। এর আগেও এদের সকলকেই তিনি বৃথা বিগ্রেডে জড়ো করেছিলেন। অর্থাৎ রাজনীতির প্রতিষ্ঠিত কলঙ্কময় ইতিহাস তিনি প্রবহমান রাখতে উদ্‌গ্রীব। আসলে দেশ বাঁচানো, মোদী হটানো ইত্যাদি ছলনার নামে তিনি দেশবাসীরকে কুস্বপ্ন দেখাচ্ছেন। প্রতিবেদনটির এক জায়গায় খুব আলগোছে মমতাকে চতুর বলা হয়েছে। চতুরের অর্থ ধূর্ত বলে মনে হয়। যার ইংরেজি হলো কানিং। এই ধূর্ততা ও তীব্র ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা পুরণের রাজনীতি করার ফলে তিনি যে বাঙ্গালির প্রতিনিধি বলে নিজেকে উপস্থাপন করেন সেটিও সম্পূর্ণ কর্দমাক্ত হয়ে যায়। ধরা পড়ে তাঁর বাঙ্গালিপ্রীতির ছলনা।

প্রণব মুখার্জি বাঙ্গালি হিসেবে প্রথম রাষ্ট্রপতি হতে যাওয়ার গৌরবময় মুহূর্তটিও তাঁর ভালো লাগেনি। সমাজবাদী দলের কিরণময় নন্দের সাহায্যে তিনি হিসেব কষে মুলায়মের দলের সমর্থন নিয়ে প্রণবকে হারাতে চেয়েছিলেন। মুলায়ম পালটি খেতেই কিছুটা অগ্রদানীর ভূমিকায় নামতে বাধ্য হন এই প্রণবদা-বিরোধী। তিনি সমর্থনে বাধ্য হন যাতে ভবিষ্যতের জন্য কলঙ্ক জমা না থাকে। সোনিয়া নিমিত্ত মাত্র। সুব্রত মুখার্জি যখন দল ছেড়ে মমতাকে ভোট কাটাকাটি করে কলকাতা পৌরসভা থেকে হটিয়ে ছিলেন (জলকর নিয়ে বিরোধ) তখন একবার বলেছিলেন মমতা অত্যন্ত পরশ্রীকাতর। কারুর উন্নতি দেখতে পারে না। প্রণববাবুর এপিসোডটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ১৯৯৮ থেকে ২০২০ অবধি তার একনিষ্ঠ সঙ্গী শুভেন্দুবাবুর ঘটনা এই তথ্যকে আরও সারবত্তা দেয়। শুভেন্দুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মধ্যে ভাইপোকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তিনি অশনি সংকেত দেখেন। শুভেন্দুর বিদায়ের আগেই ভাইপোকে লাইম লাইটে আনার মহড়া চলছিল। এইবার তার উত্তরণের পথ মসৃণ হলো।

সকলেই জানেন ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে দেশের আরও ৫ রাজ্যে নির্বাচন হয়। কোথাও এক ফোঁটা রক্ত ঝরেনি। তিনি বাঙ্গালির হয়ে ভারত জয়ে বেরিয়েছেন। তাঁর জানা উচিত মূলত তাঁর ও তাঁর দলের কীর্তিকলাপে বাঙ্গালি দেশের সর্ব প্রদেশে নিন্দিত। তিনি নির্বাচনী বক্তৃতাগুলিতে ‘কোমরে দড়ি বেঁধে প্রধানমন্ত্রীকে ঘোরাব’ ...গৃহমন্ত্রী ‘হোঁদল কুতকুত’, ‘লাড্ডু পাঠাবো পাথর ভরে’ এমন সব কুকথা উদ্গীরণ করেন যার সঙ্গে চতুর বা গুণার্থে যে কুশলী বলে অত্যন্ত চতুরতার মিশ্রণে তাঁকে প্রশংসিত করা হয়েছে যেটি খাপ খায় না। আমার এই ৫০ বছর ভোট রাজনীতি দেখার কার্যকালে কখনো দেখিনি কিছু অর্বাচীন যুবক অন্য রাজ্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ‘জানোয়ার’ বলছেন। আর একজন পুলিশবাহিনীকে বলছেন ‘এই শুয়ারের বাচ্চাগুলো এখানে কী করছে।’ সমস্ত বাঙ্গালি রাজনীতিকের নৈতিক মানে যে গভীর অবনমন ঘটেছে তার মূলে এনার বড়ো ভূমিকা আছে। নইলে এনার নাটুকে মহিলা সাংসদের লাথি মেরে মেরে সংসদের কাঁচের দরজা ভাঙার আস্পর্ধা হয় কী করে? কোনো ক্ষেত্রেই এঁদের নেত্রীকে দুঃখ প্রকাশ করতে শোনা যায়নি। ভোটে বিপুলভাবে বিজয়ী হওয়ার পরও মূল প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ওপর তাঁর প্রতিহিংসার শেষ হয়নি। শতাধিক নর-নারী খুন, ধর্ষণ, গৃহদাহ, গৃহত্যাগ সবই হয়েছে। পুলিশের হয়রানিতে মানুষ সন্ত্রস্ত অবস্থায় গ্রামেগঞ্জে টিকে আছে। অথচ এই নির্মম নেত্রী বলেছিলেন, কিছুই হয়নি। মানবাধিকার সংস্থা এসে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে। এগুলি কোনো সুশাসকের লক্ষণ নয়। অথচ এনার কাছে বাঙ্গালির যাবতীয় গৌরব, সম্ভ্রম, অহংকার গচ্ছিত আছে। ব্যাঙ্ক লকারে যেমন মূল্যবান সামগ্রী সংরক্ষিত থাকে, দরকারে গ্রাহক সেগুলি তুলতে পারে। এক্ষেত্রে কিন্তু সবই তামাদি হয়ে যাওয়ার নিশ্চিত সংকেত পাওয়া যাচ্ছে যার প্রমাণ তাঁর কিছু অতীত ও সাম্প্রতিক মন্তব্য।

(১) সেনারা মন্ত্রণালয় দখল করবে বলে দু'দিন দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে দাঁড়িয়ে আছে। (২) তারা তোলা তুলছে। দেশের সেনাবাহিনীর এমন অবমাননা ভাবা যায় না। (৩) সিএএ আইন হবে কী হবে না ইউএনএ-তে নিয়ে যেতে হবে। (৪) বালাকোটে সন্ত্রাসী ঘাঁটি ধ্বংসের প্রমাণ কোথায়? (৫) জ্বালানি তেলের দাম বাড়া নিয়ে রাস্তায় মিছিল করলেও কেন্দ্রীয় সরকার মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বহু রাজ্য সরকার দাম কমিয়ে দিলেও এই জনদরদি এক পয়সাও কমাননি। কপটতায় শীর্ষ ছুঁয়েছেন তিনি। (৬) দেশের যুবক-যুবতীদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের অপমানজনক বেতনে ঠিকেকর্মী হিসেবে নিয়োগ করেছেন। বৃহত্তর ক্ষমতায়

ফঃ ৩

এলে তিনি হয়তো তাই করবেন। (৭) পুরসভার ভোটে পারিবারিক শাসন আরও শক্তপোক্ত করতে তিনি প্রায় ৫ কোটি টাকার মালিক প্রার্থী দিয়েছেন। (৮) তিনি মিডিয়াকে তাঁবেদার করে রাখতে অভ্যস্ত, সম্প্রতি মুম্বাই প্রেসক্লাব দ্বারা ভয়ংকর তিরস্কৃত হয়েছেন। (৯) সততার প্রতীক লেখা ব্যানার খাটিয়ে রাখতে তিনি হয়তো অবচেতন মনে লজ্জা পেয়ে তা হটিয়েছেন। (১০) অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ হিসেবে তিনি প্রকাশ্যে ইউপিএ বলে কিছু নেই বলে কংগ্রেসকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। (১১) যে সুব্রত মুখার্জি তাঁকে প্রথম লোকসভার প্রার্থী হিসেবে তদবির করেছিলেন তাঁর সহোদর বোনকে তিনি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা না দেখিয়ে সাসপেন্ড করেছিলেন।

এমন একজন তীব্র প্রতিহিংসা পরায়ণ ও আদ্যপান্ত নির্দিষ্ট সম্প্রদায় দরদির যাদের সর্বাঙ্গীণ ভোটেই তিনি ক্ষমতাসীন, সেই পুঁজি নিয়ে ভারতনেত্রী হওয়া কুস্বপ্ন ও বৃহত্তর পরিসরে দেশের পক্ষে হানিকারক। হ্যাঁ, তাঁর কুশলতা অবশ্যই আছে সীমাহীন তোষণের মাধ্যমে অরাজকতা সৃষ্টির বিনিময়ে ক্ষমতা ধরে রাখায়।

—**ব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
শিবপুর, হাওড়া।

গীতার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ নেই

বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে ভগবদ্ গীতা কেন পড়ানো হবে— এই নিয়ে শিবপুর ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে কতিপয় মানুষ ক্ষোভ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গেই দু-চার কথা। ভগবৎগীতা সম্পর্কে বলা হয়েছে গীতা মানব জীবনের সংবিধান। বিজ্ঞানমনস্ক স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণা ছিল ভগবৎ গীতা। গীতাকে তিনি শ্রেষ্ঠ মানব জীবন দর্শন রূপে দেখতেন। গীতা নিষ্কাম কর্মের শিক্ষা দেয়। আসক্তি মানব জীবনের সকল দুঃখের কারণ। তাই গীতায় আসক্তিহীন কর্ম করতে বলা হয়েছে। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রবল মানসিক শক্তির অন্যতম উৎস ছিল গীতা। কত বীর বিপ্লবী ভগবদ্গীতার প্রেরণায় হাসতে হাসতে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছেন। বালগঙ্গধর তিলক, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশ চন্দ্র বসু, নেতাজী, শ্রীঅরবিন্দ, রাধাকৃষ্ণন, অ্যানি বেশান্ত, ভগিনী নিবেদিতা-সহ অসংখ্য দেশি-বিদেশি মনীষী ভগবদ্গীতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এমনকী নেহরুজীও গীতার প্রভূত প্রশংসা করেছেন। এক কথায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগবদ্গীতার অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কর্তা নোবেলজয়ী পদার্থবিদ জে রবার্ট ওপেনহাইমার গীতাকে জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রভাবশালী গ্রন্থ মনে করতেন। তিনি নিজে সংস্কৃত জানতেন। ম্যানহাটান প্রকল্পে প্রথম পারমানবিক বিস্ফোরণের পর তিনি গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৩২তম শ্লোক স্মরণ করেছিলেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়ের কথা বলেছেন। বিজ্ঞানী চার্লস টাউন্স বলেছেন, 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় জীবনকে আমরা স্বচ্ছন্দ, আরামপ্রিয় করতে পারি, কিন্তু এর জন্যে আধ্যাত্মিক পরম সত্যকে উপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই'। তিনি গীতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মিসাইল ম্যান এপিজে আব্দুল কালাম শ্রদ্ধার সঙ্গে গীতা পাঠ করতেন। ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ বলেছেন, 'মহাভারতে কৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বিজ্ঞানের চিন্তাধারার অনেক মিল আছে।

—**মন্দার গোস্বামী,**
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

পদ্মনাভ স্বামী মন্দিরের রহস্যঘেরা বন্ধ ফটক

কেরলের রাজধানী তিরুবনন্তপুরমের পদ্মনাভ স্বামী মন্দির আজও রহস্যময়। স্বামী পদ্মনাভ হলেন শ্রীবিষ্ণুর অবতার রূপ যেখানে শ্রীবিষ্ণু অনন্ত নাগের কুণ্ডলীর ওপর যোগনিদ্রায় শায়িত এবং তাঁর ডান হাতটি রয়েছে একটি জ্যোতির্লিঙ্গের ওপর। পদ্মনাভ স্বামী মন্দিরে ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় শায়িত এবং তাঁকে পাহারা দিচ্ছেন স্বয়ং অনন্ত নাগ। তথ্য অনুযায়ী স্বামী পদ্মনাভ মন্দিরে ছ'টি বন্ধ ফটক অথবা দরজার সন্ধান পাওয়া যায়। স্বামী পদ্মনাভ মন্দির পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে নির্মাণ করা হয়, কিন্তু সেই সময়কাল থেকে কোনোদিন ওই বন্ধ দরজাগুলো খোলা হয়নি। তাই স্বভাবতই দরজার ওপারে কী আছে তা এতদিন রহস্যেই ঘেরা ছিল। পরবর্তীতে ২০১১ সালে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুয়ায়ী ছ'টি দরজার নাম 'চেম্বার এবিসিডিইএফ' রেখে দরজাগুলো খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়। একটি দলের তত্ত্বাবধানে এসিডিইএফ এই পাঁচটি দরজা খোলা হয় প্রচুর মূল্যবান সামগ্রীর খোঁজ মেলে।

চেম্বার বি আজও উন্মুক্ত করা যায়নি। বলা হয় ওই দরজা আগে কয়েকজন উন্মুক্ত করার চেষ্টা করে এবং সর্প দংশন তথা অজানা কারণে তাদের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। পৌরাণিক তথ্য অনুযায়ী চেম্বার বি দরজাটি নাগপাশ মন্ত্র দ্বারা বন্ধ করা আছে যা কোনো সাধারণ ব্যক্তি বা মানুষ নির্মিত যন্ত্রদ্বারা খোলা অসম্ভব, এবং অনুরূপ কোনো প্রচেষ্টায় প্রলয় আসতে পারে। একমাত্র কোনো পরমপবিত্র সাধু যদি গরুড় মন্ত্র উচ্চারণ করতে সক্ষম হন তাহলেই তা উন্মুক্ত হতে পারে। কিন্তু এরকম সাধু ভারতে এখন নেই।

বলা হয় ওই দরজার ভিতরে অনন্ত নাগ এবং বহু নাগ বংশ রয়েছে আর দরজার অন্যপ্রান্ত হয়তো আরব সাগরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। সুতরাং ওই দরজা খুললেই হয়তো কেরলে প্রলয় আসতে পারে। নিয়মবহির্ভূত ভাবে ওই দরজা না খোলাই হয়তো আপাতত ভালো। আগামী দিনে যদি আমরা পুনরায় সেই সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিকতার অধিকারী হতে পারি তার পরই না হয় আমরা নিজেদের ওই দরজা খোলার যোগ্য মনে করবো। ততদিন না হয় বন্ধই থাকুক চেম্বার বি। রহস্যেই থাকুক স্বামী পদ্মনাভর গোপন ফটক।

—**শুভ শীল,**
রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

মানসিক দৃঢ়তার প্রতীক মানসী জোশী

সুতপা বসাক ভড়

আজ আমরা এমন একজন মাহিলার সঙ্গে পরিচিত হবো, যাঁর সম্পর্কে জানলে দেখব যে, জীবনের কত ছোটো ছোটো ব্যাপারে আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি, অথচ এই মেয়েটি তার অদম্য মানসিক দৃঢ়তার জন্য সাফল্যের সিঁড়ি অতিক্রম করে চলেছেন। তাঁর এই পথ চলা কোনো একটি লক্ষ্যে পৌঁছানো মাত্র নয়, বরং একের পর এক বাধা অতিক্রম করে আর একটি সোপানে পদার্পণ করার অপূর্ব নিদর্শন।

এক দশক আগে একটি দুর্ঘটনায় মানসী জোশী তার বাঁ-পা হারান, কিন্তু তিনি মানসিক দৃঢ়তা হারাননি। পা অথবা যে কোনো অঙ্গহানির পরবর্তীকালে বেশিরভাগ মানুষ ভেঙে পড়েন, অথচ মানসী জোশী পুনরায় ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট হাতে তুলে নেন এবং 'ফিনিক্স' পাখির মতো নবকলবরে পুনরুত্থিত হয়ে ওঠেন। উগান্ডায় অনুষ্ঠিত প্যারা ব্যাডমিন্টন ইন্টারন্যাশনালে দুটি স্বর্ণপদক ও একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতে তিনি দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন।

মানসীর বাবা হোমি ভাবা রিসার্চ সেন্টারের গবেষক। তিনি মানসীর সঙ্গে কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের জন্য ব্যাডমিন্টন খেলতেন। মুম্বাইয়ের কে. জে. সোমাইয়া কলেজ থেকে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিঙের স্নাতক মানসী সফ্টওয়ার ইঞ্জিনিয়াররূপে কর্মরতা ছিলেন। কিন্তু ২০১১-তে একটি দুর্ঘটনায় তাঁর বাঁ-পা বাদ দিতে হয়। তারপর কৃত্রিম পা নিয়ে তিনি পুনরায় পথ চলা শুরু করেন। এরপর প্রায় পাঁচমাস সময় নিয়েছিলেন পুনরায় হাঁটা-চলা ও কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসার জন্য। কিন্তু এই মানসিক অবসাদ কাটিয়ে উঠতে আরও একটু সময়ের প্রয়োজন ছিল। তারমধ্যেই তিনি আবার ব্যাডমিন্টন খেলতে শুরু করেন। পরমাণু শক্তি বিভাগের গ্রীষ্মকালীন ব্যাডমিন্টন শিবিরে কেউ কল্পনা করতে পারেননি যে, এই খেলাতে মানসী কতটা দক্ষ। এরপর মানসী আর পেছন ফিরে তাকাননি, ব্যাডমিন্টনকেই তিনি তাঁর কেরিয়ার রূপে চয়ন করেন।

মানসীর প্রথম সফলতা আসে এক বছর পরে, যখন তিনি রাষ্ট্রীয় স্তরের টুর্নামেন্টে রুপা জিতে স্পেনে প্রথম আন্তর্রাষ্ট্রীয় টুর্নামেন্টে নিজের জায়গা তৈরি করে নেন। তার জন্য হায়দরাবাদে অবস্থিত পুলেল্লা গোপীচাঁদ অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিতে আরম্ভ করেন। এরপর ২০১৫-তে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্যারা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপে মিক্সড ডবলস্-এর রৌপ্যপদক জিতে নেন। ২০১৯-এ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপে স্বর্ণপদক জিতে তিনি সাফল্যের একটি শিখর ছুঁয়ে ফেলেন। ২০১৫ সালের পর থেকে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে তিনি ক্রমাগত পদক জিতে চলেছেন।

বার্বি ডল কোম্পানি মানসীর মতো কৃত্রিম পা-সম্পন্ন বার্বিডল বাজারে এনেছে। টাইমস্ পত্রিকা তাকে পরবর্তী প্রজন্মের লিডারদের তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মানসী কেবলমাত্র নিজের জীবনে সফল নয়, তিনি আশার আলো জ্বালিয়েছেন সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে। অদম্য মনোবল ও মানসিক দৃঢ়তায় সমৃদ্ধ মানসী মাতৃশক্তির একটি অপূর্ব নিদর্শন। অভিনন্দন মানসী! অনেক শুভেচ্ছা রইল।

মুখের যত্নে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

গবেষণা অনুযায়ী, মুখের সঠিক যত্ন মুখগহ্বরের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতারও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০ ভাগ মানুষের জীবনের কোনো না কোনো সময় মুখের কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। তাই মুখের যত্নে অবেহলা একদমই নয়। মুখের স্বাস্থ্যরক্ষায় যেসব বিষয়ের উপর সচেতন থাকা উচিত :

ক্যাবিজ ও মাড়ি রোগ :

দাঁতে গর্ত বা ডেন্টাল ক্যাবিজ হয়নি এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। নিঃসৃত লালার বিশেষ উপাদান দাঁতের বিভিন্ন পৃষ্ঠে আঠালোভাবে লেগে থাকে।

নিয়মিত মুখ পরিষ্কার করা না হলে সহজেই মুখের মধ্যকার সুপ্ত অগণিত জীবাণু, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া গর্তের মধ্যে জমে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং মিষ্টিজাতীয় শর্করা খাদ্যকণা, কোমল পানীয়, আলুর চিপস প্রভৃতি খাবারকে কাজে লাগিয়ে অ্যাসিড তৈরি করে, যা দাঁতের শক্ত প্রতিরক্ষা আবরণকে ক্ষয় করে ডেন্টাল ক্যাবিজ সৃষ্টি করে। একবার গর্ত শুরু হলে সেটি বন্ধ হয় না, যতক্ষণ না ফিইলং চিকিৎসার মাধ্যমে গর্ত পূরণ করা হয়। তবে শুরুতে উপসর্গ না থাকায় চলমান ক্ষয় থেকে সংক্রমণ ভেতরের মজ্জাকে আক্রান্ত করে ব্যথা সৃষ্টি করে আর ধীরে ধীরে সংক্রমণ দাঁতের গোড়ার হাড়ে ছড়িয়ে পড়ে। তখন রুট ক্যানেল-সহ নানা জটিল চিকিৎসার, এমনকী দাঁতটিকে তুলে ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে।

অন্যদিকে দাঁত ও মাড়ির সংযোগস্থলে জমাকৃত জীবাণু থেকে মাড়িতে নানা ধরনের প্রদাহের সৃষ্টি হয়। লালা থেকে আগত বিভিন্ন অজৈব পদার্থের সঙ্গে মিশে শক্ত পাথর বা ক্যালকুলাসে রূপ নেয়, যা মাড়িকে দুর্বল করে। ফলে মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে ও মাড়ি ফুলে যায়। সঠিক চিকিৎসা না পেলে দাঁতের ধারক হাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে দাঁতকে নড়িয়ে দেয়।

শারীরিক নানা রোগের কারণেও মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়তে পারে, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হতে পারে। এসব রোগ জিইয়ে রাখলে শুধু দাঁতই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, এ থেকে সংক্রমণ রক্তে মিশে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে যে কোনো অঙ্গ যেমন হার্ট, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, রক্ত ও হাড়। আবার তা অনেক রোগকে প্রভাবিত করতে পারে যেমন ডায়াবেটিস।

অতি সংবেদনশীলতা :

জোরে জোরে বা দীর্ঘ সময় নিয়মবহির্ভূত ভাবে দাঁত ব্রাশ, কয়লা বা ছাই ব্যবহার, দাঁতে দাঁত ঘষার অভ্যাস, দাঁতে সুতো কাটা, দাঁত দিয়ে কোমল পানীয়ের বোতলের কর্ক বা ক্লিপ খোলা, অতিরিক্ত গ্যাস্ট্রিক-অ্যাসিডিটি থেকে দাঁতের স্তর ক্ষয় হয়ে দাঁত ঠাণ্ডা বা মিষ্টি খাবারের শিরশির করতে পারে।

বিভিন্ন ক্ষত :

হরমোনের তারতম্য, রক্তস্বল্পতা, অপুষ্টি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, মানসিক চাপ, বিভিন্ন ক্রনিক রোগ এবং পান, জর্দা, গুল ও ধূমপানের কারণে মুখে অনেক ধরনের ক্ষত বা ঘা দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দু' সপ্তাহের মধ্যে ক্ষতগুলো ভালো হয়ে যায়। তবে এর বেশি সময় স্থায়ী হলে অবহেলার সুযোগ নেই। কারণ অবহেলিত ঘা ক্যানসারের মতো ভয়াবহ রোগের জন্ম দিতে পারে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

কারণ, লক্ষণ ও মায়াজম মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে যে কোনো সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব।

পাদরির জামার কলার ধরেছিলেন স্বামীজী

ওই জাহাজের দুইজন সহযাত্রীর অসদাচরণে স্বামীজীকে একবার এক অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল। সহযাত্রী দুইজন ছিলেন খ্রিস্টান মিশনারি। গায়ে পড়িয়া তাঁহারা স্বামীজীর সহিত খ্রিস্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিতে লাগিয়া গেলেন। ইহাদের বিচারধারা ছিল অতি অসৌজন্যপূর্ণ। প্রতি কথায় যখন তাঁহারা হারিতে থাকিলেন, তখন ক্রমে ভদ্রতার সীমা ছাড়াইয়া ক্রোধ, বিদ্রূপ, গালাগালি প্রভৃতি হীনবৃত্তির আশ্রয় লইলেন আর অকথ্য ভাষায় হিন্দু ও হিন্দুধর্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী ধৈর্য ধরিয়া সব শুনিতেছিলেন; কিন্তু পরিশেষে আর পারিলেন না; ধীর পদক্ষেপে একজনের নিকটে গিয়া অকস্মাৎ শক্ত করিয়া তাঁহার জামার কলার ধরিলেন এবং কৌতুকভরে অথচ দৃঢ়তাপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'আবার আমায় ধর্মের নিন্দা করিলে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।' ভীত মিশনারি তখন ভয়কম্পিত দেহে ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, 'মশায়, ছেড়ে দিন; আর কখনো এমন করব না।' ইহার পর তিনি কৃতাপরাধের দণ্ডস্বরূপ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই অত্যন্ত বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করিয়া তাঁহার বন্ধুত্বলাভে যত্নপর থাকিতেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের পর একদিন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 'আচ্ছা সিংহ, কেউ যদি তোমার মাকে অপমান করে তাহলে তুমি কি কর?' প্রিয়নাথবাবু অমনি উত্তর দিলেন, 'মশায়, তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিই।' স্বামীজী বলিলেন, 'আচ্ছা, বেশ কথা! যদি তোমার ধর্মের প্রতি ঠিক সেই রকম অচলা ভক্তি থাকত, তাহলে, তুমি কখনও একটি হিন্দুর ছেলেকে খ্রিস্টান হতে দেখতে পারতে না। কিন্তু দেখ, রোজ এ ঘটনা ঘটছে। 'অথচ তোমরা নীরব রয়েছ। বাপু, তোমাদের বিশ্বাস কই? দেশের প্রতি মমতা কই? মুখের উপর প্রত্যহ পাদরিরা তোমাদের ধর্মকে অসংখ্য গাল দিচ্ছে; কিন্তু কয়জন লোকের রক্ত যথার্থ অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে গরম হচ্ছে?'

(স্বদেশের পথে গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

যুব দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণে রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাসভবন ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন স্বস্তিকার প্রতিনিধি অনামিকা দে ও নিখিল চিত্রকর।

স্বামীজীর মতো দু-একজনই হিমালয়ের চূড়ায় উঠতে পারেন : স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ

প্রঃ ১৯৮৪ সালের ১২ জানুয়ারি ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ১৯৮৫ থেকে প্রতিবছর যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনটিতে জাতীয় যুব দিবস পালন করি আমরা। রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে এই দিনটির তাৎপর্য কী?

উঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনটিকে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালন করার যে সিদ্ধান্ত ভারতসরকার নিয়েছেন তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমেই যেটি মনে হয় তা হলো, স্বামীজীর রূপ। তিনি ছিলেন তারুণ্যের প্রতীক। তিনি উনচল্লিশটি বসন্তের বেশি এই পৃথিবীতে থাকেননি অর্থাৎ তাঁর বৃদ্ধাবস্থা আমাদের কল্পনায় নেই। তিনি হলেন সদাসর্বদা যৌবনের প্রতীক, তারমধ্যে কোনো স্থবিরতা বা আলস্য আমরা দেখিনি। তিনি উৎসাহ, উদ্যম, পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। স্বামীজী সকলকে মানুষ হতে বলছেন। তিনি প্রার্থনা করছেন— হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করো। অর্থাৎ তাঁর প্রার্থনার মধ্যে দিয়েও তিনি প্রকৃত মানুষ হতে চেয়েছেন। তিনি হয়ে উঠেছেন শক্তি, সাহস, শৌর্যবীর্যের প্রতীক। তাই তাঁর অনুপ্রেরণায় যাতে যুব সমাজ অনুপ্রাণিত হয় সেই লক্ষ্যেই ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মদিন প্রকৃত অর্থেই যুব দিবস। স্বামীজী বলছেন, 'Arise, awake and stop not till the goal is reached' অর্থাৎ ওঠো, জাগো ও যতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারছো ততক্ষণ পর্যন্ত থেমো না। স্বামীজী তাঁর বাণীর মাধ্যমে যুব সমাজের

কাছে বার্তা দিয়েছেন যে জীবনে যত প্রতিকূলতাই আসুক, সকল বাধা কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। তিনিই আমাদের সর্বকালের আদর্শ যুগপুরুষ।

প্রঃ বর্তমান যুব সমাজে পাশ্চাত্যের প্রভাব অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়, সেখানে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব যেমন রয়েছে তেমনই গ্লোবালাইজেশনের ফলে বিশ্বের সব সংস্কৃতির ছোঁয়া তাদের হাতের তালুতে। এমন সময়ে দাঁড়িয়ে আজকের যুবক-যুবতীরা কি পশ্চিমি ভাবধারাকেই বেশি আত্মস্থ করে ফেলছে স্বামীজীর আদর্শকে বিস্মৃতির আড়ালে রেখে?

উঃ স্বামী বিবেকানন্দের বার্তা সমন্বয়ের বার্তা। স্বামীজী বলছেন, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানচর্চা, কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে ভারতবর্ষের পবিত্র বেদান্তের বাণীর সমন্বয় ঘটিয়ে সার্বিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। ত্যাগ, সেবা সব একীভূত হয়ে নতুনভাবে, সমন্বয় ঘটিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আজ বিশ্বায়নের যুগে সোশ্যাল মিডিয়ার দিনেও বহু ছেলে-মেয়ে রয়েছে যারা জাগতিক উন্নতির শীর্ষে উঠেও ত্যাগ ও সেবাধর্মে ব্রতী হয়েছে। সুতরাং আজকের প্রজন্ম স্বামীজীর আদর্শকে গ্রহণ করছে না— এটা ভুল কথা। Your attitude determine your altitude। একটি থিয়োরি আছে GIGO, garbage in garbage out। অর্থাৎ আমার অন্তঃকরণ যদি অশুদ্ধ হয় তবে আমি অশুদ্ধই দেখব আর ভেতরটা যদি শুদ্ধ থাকে তবে শুদ্ধই দেখবো। ত্যাগ, সেবা, সংযমের আধারে বহু মানুষ আজও রয়েছেন। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, হিমালয়ের চূড়ায় সকলে উঠতে পারে না। সবাই গড্ডলিকা প্রবাহেই চলবে তবে তার মধ্যে থেকে দু-চারজনই ওই শিখরে পৌঁছবে। কারণ স্রোতের বিপরীতে কিছু মানুষই থাকে, সবাই থাকতে পারে না। মহাভারতের যুদ্ধেও আমরা দেখেছি ১০০ জন কৌরবের বিরুদ্ধে পঞ্চ পাণ্ডবকে ধর্মযুদ্ধ করতে। সত্যের পথে থাকা একজনও একশো জনের সমান, যেমন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। স্বামীজী বলেছিলেন, 'আমি একশো জনকে পেলে সমাজের ভাবস্রোতকে পালটে দিতে পারি।' একশো যুবক স্বামীজী পেয়েছিলেন কিনা জানি না তবে তিনি নেতজীকে পেয়েছিলেন।

প্রঃ আপনার মতে গড্ডলিকা প্রবাহের বিপরীতে যাওয়া ওই একজন বা দুজন তৈরির ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন কীভাবে সাহায্য করছে সমাজকে?

উঃ আমরা রামকৃষ্ণ মিশনে যতটা আশা করি ততটা হচ্ছে না ঠিকই কিন্তু মানুষ তৈরির কারিগরের কাজ আমরা প্রতিনিয়ত করছি। তবে এটুকু বলতে পারি এই শিক্ষা প্রদানের পরও সমাজের এই অবস্থা যদি এই ভূমিকায় কোনো খামতি থাকতো আমাদের তাহলে কতটা করুণ অবস্থা হতো সেটা ভাবতে হবে। মনে রাখতে হবে, যখন কোনো বিপ্লব আসে সব তুলকালাম করে দেয়, তারপরে একটা স্থিতাবস্থা আসে। এখন হতে পারে এই পাশ্চাত্যবাদ, ভোগবাদ জড়বাদের একটা প্রভাব চলছে, স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ জেগে উঠছে। এরপর স্থিতাবস্থা আসবে যখন যুব সমাজ আবার স্বমহিমায় গৌরবান্বিত হবে। মনে রাখতে হবে সেই অমোঘ বাণী— 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' সত্যি যদি আদর্শের জন্য জীবনযাপন করা যায় তার ক্ষয় হয় না। এর প্রকৃত উদাহরণ স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা। স্বামীজী তাঁর অনুগামীদের বলছেন, 'ওরে তোরা খেটে খেটে মরে যা, আমি দেখে শান্তি পাই'। তিনি তাদের এত ভালোবাসতেন তবু একথা বলতেন, কারণ তিনি চাইতেন তারা কিছু করুক। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে বলেছিলেন 'তোকে বটবৃক্ষ হতে হবে, সকলকে স্থান দিতে হবে'। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'— এই আদর্শই দিয়ে গেছেন স্বামীজী আমাদের।

প্রঃ স্বামীজীর বাণীকে আজকের প্রজন্মের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে দিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, স্কুল এবং পাঠক্রমের কী ভূমিকা হওয়া উচিত?

উঃ আজকের সমাজের সার্বিক যে অবক্ষয় তাতে স্বামীজীর বাণীই একমাত্র পথ। একটা ভাঙা আয়না যদি সূর্যালোকের সংস্পর্শে রাখা হয় দেখবেন সেই আয়নাটির মধ্যে সূর্যের দহনদ্যুতি প্রবেশ করে। মনে রাখতে হবে, আমরা যদি স্বামীজীর সঙ্গ করি তবে আমাদের মধ্যে স্বামীজীর সেই তেজ এসে উপবিষ্ট হয়। স্বামীজী বলছেন, 'আমি হচ্ছি অশরীরী বাণী, আমি ততদিন পর্যন্ত কাজ থেকে বিরত হব না যতদিন পর্যন্ত মানুষ বুঝতে পারে যে সে ঈশ্বরের সঙ্গে এক'। তাঁর এই আদর্শকে আমাদের সন্তানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই হবে। শিক্ষা প্রদানের মধ্য দিয়ে অবশ্যই নব প্রজন্মের কাছে পৌঁছতে হবে।

প্রঃ স্বামীজী সনাতন সভ্যতাকে বিশ্বব্যাপী উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজ ভারতের মাটিতে আমরা স্বাধীনতার ৭৫ বছর পালন করছি, কিন্তু ইতিহাস ও বর্তমান দুই-ই বলছে আজ সনাতনীরা বিপদগ্রস্ত। আক্রমণ হচ্ছে তাদের অস্তিত্বের ওপর ও বিশ্বাসের ওপর। এই বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন। এর প্রতিকারই-বা কোথায়?

উঃ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। এটা সত্যি যে সনাতনীদের ওপর আক্রমণ হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। সনাতন ধর্ম যেন আজ কিছুটা বিপন্ন। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের দুর্গাপুজোর সময় হিন্দুদের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করা হয়েছে। তবে এর প্রতিকার হিসেবে একটি কথাই মাথায় রাখতে হবে তা হলো সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। আমার মনে হয় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোথাও আমাদের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। সনাতনীদের সংগঠিত করতে হবে, এইটি একমাত্র পথ। ■

শাশ্বত প্রেরণার উৎস স্বামী বিবেকানন্দ

নিখিল চিত্রকর

ডা: সৈকত দাস

মৈনাক মুখার্জি

রণদীপ সাহা

১২ জানুয়ারি। ভারতের চিরসবুজ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব দিবস। ভারতের জাতীয় যুব দিবস। আক্ষরিক অর্থেই স্বামীজী চির তারুণ্যের প্রতীক। যুব আইকন। তাঁর জন্মদিন যে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে পালিত হবে, তা কাঙ্ক্ষিত। যুব সমাজের প্রেরণাস্রোত স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা চিরায়ত। তাঁর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনকে অনন্য মাত্রা দিয়েছেন বহু কিংবদন্তী। সেই তালিকায় রয়েছেন সুভাষচন্দ্র বসু, অরবিন্দ ঘোষ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, অ্যানি বেসান্ত, নিকোলা টেসলা, নরেন্দ্র মোদী-সহ আরও অনেকে। বেদান্তকে এক অন্য পর্যায়ে উন্নীত করে স্বামীজী এঁদের সকলের জীবনকে আরও বেশি করে আলোকিত করেছেন। আলোর দিশারি স্বামীজীর সেই কর্মযজ্ঞ আজও অনির্বাণ। এদেশের যুবসমাজ যুগাবতার সন্ন্যাসীর আদর্শ আঁকড়ে ধরে কিশোর বয়স থেকেই। সাম্প্রতিক যে সময় চক্রকে সমাজের অবক্ষয় হিসেবে সমালোচনা করা হয়, সেই কালেও এখনকার যুবশক্তি স্বামীজীর আদর্শকে ধ্রুবতারা করে দেশ ও সমাজ গঠনে তাঁদের অবদান রেখে চলেছে।

বাণিজ্যক্ষেত্র, সমাজ মাধ্যম, শিক্ষা জগৎ, খেলার দুনিয়া, চিকিৎসা ক্ষেত্র, রাজনৈতিক পরিসর থেকে দেশের নিরাপত্তা, সর্বত্রই যুবশক্তির জয়জয়কার। প্রত্যেকেই নিজের জীবনে স্বামীজীর আদর্শ ও অনুপ্রেরণার কথা বিশেষ করে বলেছেন। এমন অনেক যুবক-যুবতী আছেন যাঁরা নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়েছেন কিন্তু প্রচারের আলোয় তেমন আসেননি।

কলকাতার ছেলে রণদীপ সাহা প্রযুক্তিবিদ্যার ছাত্র থাকাকালীন গ্রামবাঙ্গলার মাটির তৈরি হস্তশিল্প সংগ্রহ করে রপ্তানি শুরু করেছিলেন। ‘রেয়ার প্ল্যানেট’ নামে সংস্থা গড়ে সমস্ত মৃৎশিল্পীদের প্রতিভা তুলে ধরছেন বিশ্বমঞ্চে। বিশ্বের বড়ো বড়ো দেশের বিমানবন্দরে শোভা পাচ্ছে বাঙ্গলার মৃৎশিল্প। উদ্যোক্তা কলকাতার রণদীপ। রণদীপের সংস্থার মাসিক টার্নওভার আজ কোটির অঙ্কে। আত্মনির্ভর ভারতের ভিত মজবুত করছেন রণদীপের মতো যুবপ্রজন্ম।

মুর্শিদাবাদের সৈকত দাস এমবিবিএস পাশ করে জেনারেল ফিজিসিয়ান হিসেবে সরকারি হাসপাতালে প্র্যাক্টিস করছেন। পাশাপাশি মেডিসিনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর ছাত্রজীবন আদ্যোপান্ত স্বামীজীর আদর্শে উদ্দীপ্ত। ‘অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল মন আমাদের নিয়ত নিম্ন থেকে নিম্নতর স্তরে নিয়ে যাবে এবং চরমে আমাদের বিধ্বস্ত করবে, ধ্বংস করবে। আর সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত মন আমাদের রক্ষা করবে, মুক্তিদান করবে’— স্বামীজীর এই বাণী দাগ কেটেছিল সৈকতের মনে। সবার মধ্যে থেকেও নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়েছেন সৈকত। ছাত্রাবস্থাতেই নানা সমাজসেবামূলক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। চিকিৎসক জীবনে মুন্সিয়ানার দরুন এখন মুর্শিদাবাদে ‘ছোটো ডাক্তারবাবু’ হিসেবে তিনি পরিচিত। প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিনে কলকাতার তস্য বস্তিতে অথবা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে সহযোদ্ধাদের নিয়ে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প করতে ছুটে যান ডাঃ সৈকত দাস।

‘দেশবাসীর জন্য কিছু করো, তাহলে তারাও তোমাদের সাহায্য করবে, সমগ্র জাতি তোমার পিছনে থাকবে। সাহসী হও, সাহসী হও ! মানুষ একবারই মরে।’ —স্বামীজীর এই অমোঘ উক্তি দাগ কেটেছিল তরুণ মৈনাক মুখার্জির মনে। তারপর মৈনাক, শুচিস্মিতা ও সুরজিৎ-সহ একঝাঁক যুবক-যুবতীর মিলিত প্রয়াসে গড়ে উঠল ‘বর্ধমান ফুডিজ ক্লাব’। লক্ষ্য ছিল শহরের অভুক্ত মানুষগুলোর মুখে অন্ন তুলে দেওয়া। তৈরি হলো ফুড ব্যাঙ্ক। বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়ির অতিরিক্ত খাবার এনে অভুক্ত মামুষগুলোকে খাওয়ায় বর্ধমান ফুডিজ ক্লাব। ফেসবুকের মতো সমাজমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে, সহানুভূতিশীল মানুষদের একছাতার তলায় এনে সবার স্বল্পদামের বিনিময়ে সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন মৈনাকরা। রক্তদান শিবির, পড়াশোনার সামগ্রী বিতরণ, ফ্রি কোচিং ক্লাসের মতো কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে আলোড়ন তুলেছে বর্ধমানের এই তরুণ সমাজসেবী দল। ‘ফিড ১০০’ নামে তাদের নতুন মিশন বিপ্লব ঘটিয়েছে সমাজমাধ্যমে। ৩৬৫ দিনের জন্য ৩৬৫ জন একদিন করে ১০০ জন মানুষকে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। এই মিশনে সাড়া দিয়ে রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ ও দেশের বাইরের মানুষও সেবার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন মৈনাকদের উদ্যোগ সফল করার জন্য।

যুব সমাজই তারুণ্যের শক্তি ও দেশের সমৃদ্ধির সোপান। দেশ-কাল ও সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে যুগে-যুগে স্বামী বিবেকানন্দ সেই যুব সমাজের কাছে শাশ্বত হিমালয় স্বরূপ। যিনি অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন যুবশক্তিকে। যাঁর আদর্শের ধারায় সবুজ কচি-কাঁচাগুলো প্রাণবন্ত হয়ে মহীরূহ হয়ে ওঠার রসদ পায়। বর্তমানে এদেশের যে অগ্রগতি, তার উৎসমুখ যুবসমাজ। এই তারুণ্যের উপবনে নিহিত আছে এক কর্মযোগীর গৈরিক সাধন শক্তি–– তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। ▮

ক্যানভাস থেকে রুপোলি পর্দায়

তুলি দিয়ে ক্যানভাসের ওপর নিজের কল্পনা ও বাস্তবের রং চাপিয়ে যখন ফুটিয়ে তুলতো নানান ছবি তখনই মনের মধ্যে কোথাও উঁকি দিয়েছিল ওই ইচ্ছেটা। সিনেমা তৈরির ইচ্ছে, ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে বলার ইচ্ছে— লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন। আজ বেশ কয়েকটা শর্ট ফিল্ম তৈরি করে ঝুলিতে পুরস্কারও এসেছে। তবে স্বপ্ন এখন আকাশ ছোঁওয়ার। ক্যানভাস থেকে রুপোলি পর্দায় এই যাত্রার অভিজ্ঞতা জানালেন তরুণ শর্ট ফিল্ম মেকার অভিজিৎ অলোক পাল।

প্রঃ আপনার সিনেমা তৈরির অনুপ্রেরণা কোথায়?

উঃ যখন ক্লাস টেনে পড়ি তখন থেকেই মনের মধ্যে একটি ইচ্ছে ছিল। ছোটো থেকেই ছবি আঁকতাম। মনে হতো, সত্যজিৎ রায় যদি শান্তিনিকেতন থেকে ফাইন আর্টস নিয়ে পাশ করে ফিল্ম মেকার হতে পারেন তবে আমারও চেষ্টা করতে ক্ষতি কোথায়। তাঁর ছবিই আমার অনুপ্রেরণা। তাঁর ছবি দেখতে দেখতেই বড়ো হওয়া, তাঁর প্রত্যেকটা ফ্রেমকে বোঝার চেষ্টা করি। যখন ফাইন আর্টস নিয়ে গ্রাজুয়েশন করছি তখন রেনেসা থেকে পোস্ট মর্ডানিজমের পেইন্টিংগুলো যখন দেখি কোথাও যেন মনে হয় সত্যজিৎ রায় তাঁর ফ্রেমিং সেন্সগুলো এখান থেকেই নিয়েছেন। তার থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে আমার আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়া। এশিয়ার বেস্ট কলেজ বরোদা আর্ট কলেজ তাতে চান্স পেয়ে গেলাম।

প্রঃ প্রথম ক্যামেরা ধরা কবে থেকে?

উঃ আর্ট কলেজে আমার শিক্ষক ইন্দ্র রায় আমায় রূপকলায় পাঠালেন প্রথম এসথেটিকালি ফিল্ম এডিটের একটি ওয়ার্কশপে। আমাদের কলেজেও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ক্রিয়েটিভিটি অনুযায়ী স্টুডেন্টদের গাইড করা হতো সেটা আমায় খুব হেল্প করেছে। ওই সময়ে ক্যামেরা হাতে ছোটো ছোটো অনেক শর্ট ভিডিয়ো প্রজেক্ট করেছিলাম পেইন্টিংসের সঙ্গেই।

প্রঃ প্রথম অ্যাওয়ার্ড পাওয়া কোন সালে?

উঃ প্রথম অ্যাওয়ার্ড ২০০৬-এ। ইনল্যান্স ফাইন আর্টস থেকে পেইন্টিঙের ওপর ওরা অ্যাওয়ার্ড দিয়েছিল, এতে ক্যাশ প্রাইজ ছিল ষাট হাজার টাকার।

প্রঃ বিষয়বস্তু কী থাকতো আপনার আঁকায়?

উঃ আমার আঁকায় অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট খুব একটা পাবেন না, ন্যারেটিভ ওয়ার্ক করতেই বেশি পছন্দ করি, রবি বর্মার ছবি যেমন ওয়েস্টার্ন ও ইন্ডিয়ান আর্ট-এর মেলবন্ধন, সেটা আমায় খুব প্রভাবিত করে। ওই সময় আমি বিদেশি বই পড়ছি, ওদের ফিলোজফি বোঝার চেষ্টা করছি। ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিল্পকে মেলাতে চেষ্টা করেছি। আর বাণিজ্যিকরণ বলতে ওই সময়ে আমার আঁকা হর্ষ গোয়েঙ্কা আড়াই লাখ টাকায় কিনেছিলেন। সেই টাকা আমার পরের পড়াশুনা ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে। এরপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দামে আমার আঁকা ছবি বিক্রি হয়েছে। অবশ্য এই ছবি বিক্রির টাকা জমিয়ে ছোটো ছোটো শর্ট ফিল্ম তৈরি করতে শুরু করেছিলাম তখনই। গল্প লিখতাম, স্যারদের দেখাতাম। স্যারেরাও অ্যাপ্রিসিয়েন্ট করতেন, আমিও নতুন উদ্যোগ পেতাম। এভাবেই শুরু।

প্রঃ প্রফেশনালি শর্ট ফিল্ম বানানোর জার্নি শুরু কবে থেকে?

উঃ 'স্ক্রিপটেড' বলে একটি শর্ট ফিল্ম বানিয়েছিলাম প্রথমে আমার ক্লিক ক্যামেরা দিয়ে। কলেজের স্যারেরা খুব প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে পয়সা জমিয়ে, পেইন্টিং বেচে ও মেসোর থেকে টাকা নিয়ে একটা ভালো প্রফেশনাল ক্যামেরা কিনি। সেই দিয়েই প্রথম প্রফেশনাল ১৫ মিনিটের শর্ট ফিল্ম 'স্ক্রিপটেড' তৈরি। এরপর সেটা বিভিন্ন ফেস্টিভালে পাঠানো এবং সেখানে বেশ কিছু জায়গায় 'স্ক্রিপটেড' নমিনেটেড হয়েছে, আওয়ার্ডও পেয়েছে।

প্রঃ বেশ কয়েকটা ফেস্টিভ্যালে আপনার কাজ জায়গা করে নিয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা কথা যদি বলেন?

উঃ 'ছিপি' আমার আরেকটি শর্ট ফিল্ম, ২০১২-এ করা। এটা 'ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স ফেস্টিভাল অব ইন্ডিয়া'-তে জুরি আওয়ার্ড পায়। লকডাউনেও দুটো ছবি বানালাম। শাহরুখ খানের রেড চিলিজের একটা কম্পিটিশন হয়েছিল, ২০২০ জুনে, তাতে 'পেনসিল' বলে একটা শর্ট ফিল্ম বানিয়েছিলাম, সেটাতে নিয়ম করেছিল বাইরে থেকে কোনো আর্টিস্ট, সিনেমাটাগ্রাফার আনা যাবে না। আমি বাড়িতেই নিজের দুই ভাইপোকে নিয়ে সিনেমাটা বানিয়েছিলাম, ফার্স্ট প্রাইজও পেলাম। এরপর করলাম 'অ্যাম আই', ২০২০ আগস্টে। এনএফডিসি ও মিনিস্ট্রি অব ব্রডকাস্ট থেকে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিলাম। এটাও লকডাউনেই বানিয়েছিলাম, বিষয় ছিল আত্মনির্ভর ভারত। ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার পর ন্যাশনাল চ্যানেল, ন্যাশনাল প্রিন্ট মিডিয়াগুলো কভার করেছিল। কিন্তু এ রাজ্যের খুব কম নিউজেই ওটা এসেছে। তাই খুব যে মাইলেজ পেয়েছি তা নয়। এরপর করলাম এবছর ২০২১-তে 'নাদ'।

ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল-এ উইনার হলাম। ওরা ডাকল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার কোভিড হওয়ায় আমি যেতেই পারলাম না। এই প্রাইজটাকে বলা হয় ভারতের অস্কার, ওখানে গেলে অনেক যোগাযোগ বাড়ত হয়তো বড়ো ফিল্ম করার যে স্বপ্ন তারও কোনো সূত্র পেতাম। মনে হচ্ছে কোভিডের জন্য একটা বছর পিছিয়ে গেলাম।

(সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অগ্নিদীপ্তা নাথ)

ফঃ ৪

পৌষের পার্বণে স্বাদে আহ্লাদে

শুভ্রা দে

পৌষ সংক্রান্তি ভারতবর্ষের এক আনন্দঘন উৎসব। এই উৎসব মানুষ কতভাবে যে পালন করেন তার ঠিক নেই। বলা হয় পৌষলক্ষ্মীর উৎসব। যেসব মানুষ সারা বছর রোদে জলে কষ্ট করে ধান রোপণ করেন, এ সময় তা ঘরে তোলা হয়। এ হলো সমৃদ্ধির মাস। মানুষ পৌষলক্ষ্মীকে স্বাগত জানায়। ঘরে ঘরে নানা পিঠে পায়েসের সুগন্ধ ছড়িয়ে যায়।

আস্কে পিঠে :

প্রথম দিন হয় আস্কে পিঠে বা সিদ্ধ পিঠে। নতুন চাল ভিজিয়ে দিতে হবে। ভিজে গেলে জল ঝরিয়ে শিলে পিষে নিন। দশকর্মার দোকানে ছাচ পাওয়া যায়, এনে ধুয়ে রাখুন। নতুন খেজুর গুড় (পয়রা গুড়) নিয়ে আসুন, নারকেল কুরে রাখুন।

এবারে হাঁড়িতে জল বসান। ফুটে উঠলে ছাঁচটা হাঁড়ির মুখে রাখুন। তার ওপরে যে চালটা গুঁড়ো করে রেখেছেন, সামান্য জল দিয়ে মাখুন, গোল করে ছাঁচের ওপর দিন। জলের ভাপে সেদ্ধ হবে। কোরা নারকেল আর পাতলা গুড় দিয়ে খান, তোফা! নোনতা পিঠে ঠিক এভাবেই হবে তবে একটু তরকারির পুর, ফুলকপি বা বাঁধাকপি একটু বড়ো করে পুলি করে তার মধ্যে ভরে দিন, ছাঁচে দিন। ধনেপাতার চাট্‌নি দিয়ে খান।

মালপোয়া :

দুধের মধ্যে চিনি, সুজি, ময়দা, সামান্য মৌরি দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন।

কড়ায় সাদা তেল গরম হয়ে গেলে হাতায় করে দিন, এক পিঠ হয়ে গেলে উলটে দিন। খুব সহজে একটা স্বাদের খাবার। খুব পাকা কলা কালো হয়ে গেলে কেউ খাবে না। ময়দার সঙ্গে কলা চটকে নিন। চিনি দিয়ে মেখে দুধ দিন। এবার ভেজে ফেলুন। দেখুন কী স্বাদ।

পাটিসাপটা :

মিষ্টি পিঠে পুলির প্রথমেই যার নাম আসে তা 'পাটিসাপটা'। তাওয়ায় করা যায় তবে ফ্রাইং প্যানে সুবিধে হয়। ময়দা নিন দু'কাপ, দু'চামচ সুজি জল দিয়ে গুলে নিন। নারকেল কুরে পাক করে নিন, গুড় বা চিনি দিয়ে। নাড়ুর পাক হবে। এবার প্যান ওভেনে চড়ান। গরম হলে হাতায় করে ঢেলে দিন। আঁচ কম থাকবে। একটা দিক হয়ে এলে খানিকটা নারকেলের পুর নিয়ে ওটির মাঝখানে লম্বা করে দিন। এবার খুন্তি দিয়ে পাশ থেকে

মুড়ে মাথা আর তলাটা একটু চেপে দিন। আস্তে আস্তে মুড়ে মাদুরের মতো রোল করে দিন। এবার খুন্তি দিয়ে আস্তে করে নামিয়ে সাজিয়ে রাখুন পর পর। আবার এই জিনিসই ক্ষীর দিয়ে করতে পারেন। কিশমিশ দিন, ক্ষীরটা চিনি দিয়ে নেড়ে নিন।

মুগের ভাজা পুলি :

মুগের ডাল ভেজে সেদ্ধ করে নিন। একটুও জল থাকবে না। এর মধ্যে অল্প ময়দা ও সুজি দিয়ে মেখে লেচি করুন। বাটির মতো করে ভেতরে নারকেলের পুর দিতে হবে। এবারও নারকেল গুড় দিয়ে নাড়ুর পাক দিয়ে নেবেন। পুলির মতো গড়ে নিন, ভাজুন, গরম গরম খান। একটা কথা, যাই করুন ধৈর্য নিয়ে করুন।

ক্ষীরের মোমো :

মোমো তো আমিষ, নিরামিষ অনেক রকমই হয়। পিঠের সময় তো, আমি ক্ষীরের মোমো বানাব। ক্ষীর, চিনি, কিশমিশ, কাজু একসঙ্গে মাখুন যেন শুকনো থাকে, এবার ময়দা অল্প ময়ান দিয়ে মেখে লেচি করুন। লুচির মতো বেলুন, মাঝখানে ক্ষীর গোল করে দিন। এবার লেচির চারদিক থেকে নিয়ে মাথার কাছে জড়ো করুন, পুটলির মতো মাথার কাছটা একটু পাকিয়ে দিন, এবার ভেজে রাখুন।

গোবিন্দভোগ চালের পায়েস :

গোবিন্দ ভোগ চাল ঘিয়ে ভেজে নিন। নামিয়ে নিন, দুধ ফুটতে দিন, দুধটা বেশ ঘন হবে। ঘিয়ে ভাজা চাল দুধে ছেড়ে দিন। চাল সেদ্ধ হয়ে ঘন হবে। চিনি ড্রাইফ্রুট, এলাচ গুঁড়ো দিন। ভাজা সেসবই দুধে দিন, দু'ফুট হলে নামিয়ে দিন। দেখুন তো কী পরিতৃপ্তির সঙ্গে সবাই খাচ্ছে, পূর্ণতার উৎসব তো।

দুধ পুলি :

চালের গুঁড়ির সঙ্গে অল্প সুজি দিয়ে মেখে লেচি করুন। বাটির মতো করে তাঁর মধ্যে নারকেলের পুর দিয়ে পুলি করুন। এবার দুধ ঘন করতে দিন। দুধ ঘন হলে কয়েকটি পিঠে দিন। বেশ কিছুক্ষণ ফুটলে সেদ্ধ হয়ে যাবে এবার নতুন গুড় দিন। বেশ ঘন থাকতে নামান। এটি খুবই উপাদেয়।

রাঙা আলুর পুলি :

বড়ো কড়ায় জল চাপান। এতে রাঙা আলুগুলো দিন। একটু পরে দেখুন সেদ্ধ হয়েছে কিনা। বেশি সেদ্ধ করা যাবে না। নখ ফুটিয়ে দেখে একটুকরো হাত দিয়ে স্ম্যাশ করুন। যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সবগুলো নামিয়ে নিন। একটা একটা করে খুব ভালো করে মাখুন এবার ওতে সামান্য ময়দা দিন। একটু ডিমের মতো আকারে তৈরি করুন। তারপর তেলে লাল করে ভেজে ঘন রসের মধ্যে ফেলুন।

ছোলার ডালের বরফি :

আড়াইশো গ্রাম ছোলার ডাল প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করুন। সেদ্ধ হলে মিক্সিতে মিহি করে পিসে নিন। কড়ায় ঘি বা সাদা তেল দিন। তেল গরম হলে ওতে মাখাটা ঢেলে দিন, কম আগুনে আস্তে আস্তে নাড়তে থাকুন। নাড়তে-নাড়তে মোটামুটি ভাজা ভাজা হলে ওতে ক্ষীর, চিনি, ড্রাইফ্রুট, ছোটো এলাচের গুঁড়ো দিয়ে এমন ভাবে নাড়ুন যাতে সবটা বেশ মিশে যায়। যখন দেখবেন কড়া থেকে উঠে আসছে তখন একটা স্টিলের বড়ো থালায় তেল মাখিয়ে ঢেলে দিয়ে হাত দিয়ে চেপে চেপে দিন। এবার খুন্তি দিয়ে বরফির মতো করে কেটে দিন। ঠান্ডা হয়ে শক্ত হলে পরিবেশন করুন।

কড়াইশুঁটির চপ :

কড়াইশুঁটির দানাগুলি অল্প ভাপিয়ে মিক্সিতে পিসে নিন। তাতে সেদ্ধ আলু, লঙ্কাগুঁড়ো, ভাজা ধনে গুঁড়ো, আদা, রসুন বাটা, গরম মশলার গুঁড়ো নুন ও কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালো করে মেখে ছোটো ছোটো বলের আকারে তৈরি করে নিতে হবে। এবার বলগুলো ডিমের গোলায় ডুবিয়ে ব্রেডক্রাম্বে রোল করে তেলে ভেজে নিন। এবং গরম গরম পরিবেশন করুন।

পটলের মিষ্টি :

তাজা পটলের ওপরের খোসা ছুরি দিয়ে হাল্কা হাতে চেঁছে ফেলুন। এবার পটলের মাঝখানটা ছুরি দিয়ে সাবধানে চিরুন। ভেতরের বীজগুলি ফেলে দিন। ক্ষীর কিসমিস মাখা আস্তে আস্তে ভরে দিন। কড়ায় তেল গরম হয়ে গেলে একটু ঠাণ্ডা করে দু' একটা করে পটল দিন যেন ভাজা হয়ে না যায়। চওড়া বাসনে রস রাখুন। রস গরম থাকতে পটলগুলো ওর মধ্যে থাকবে। পরে তুলে রাখবেন।

চালের পায়েস :

১০০ গ্রাম গোবিন্দভোগ চালে চারপ্যাকেট দুধ লাগবে। ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। কড়াইতে সামান্য ঘি দিয়ে চালটা সামান্য ভেজে নিন। সব দুধটা ফোটান, চালটা এই সময় দিয়ে দিন। দুধ ঘন হবে, চালও সেদ্ধ হবে। চাল সেদ্ধ হলে বাতাসা, চিনি, ড্রাইফ্রুট দিন। নামাবার আগে নতুন পাটালি গুড় দিন। দেখুন সারা বাড়ি গন্ধে ম-ম করছে। শীতে এই পায়েস হলো মহাভোগ। ◻

গঙ্গাসাগরে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্মেলন

গত ২৪-২৫ ডিসেম্বর গঙ্গাসাগরে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন, সরস্বতী বন্দনা এবং ভারতমাতা ও মা সরস্বতীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভারম্ভ হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সহ সভাপতি গোপাল মিত্র। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক, রাজ্য কোষাধ্যক্ষ জগদানন্দ নস্কর। জেলার ৭৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার গৌরবময় ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় কর্তব্য বিষয়ে আলোকপাত করেন বাপী প্রামাণিক। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন জগদানন্দ নস্কর। জেলা সম্পাদক আগামী তিন বছরের যোজনা, পরবর্তী কার্যক্রমর রূপরেখা ও স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব সমিতির পরিকল্পনা সবিস্তারে তুলে ধরেন। রাজ্য সভাপতি আগামী তিন বছরের জন্য জেলা সভাপতি– অলোকেন্দু অধিকারী, জেলা সম্পাদক --- সৈকত মণ্ডল ও জেলা কোষাধ্যক্ষ – তাপস চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ২১ জনের জেলা সমিতি ঘোষণা করেন। সমাপ্তি বক্তব্যে তিনি দেশের কল্যাণে শিক্ষক সমাজের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন। জেলা সম্মেলনের স্মরণিকা প্রকাশ ও বন্দে মাতরম্ গীতের পরে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

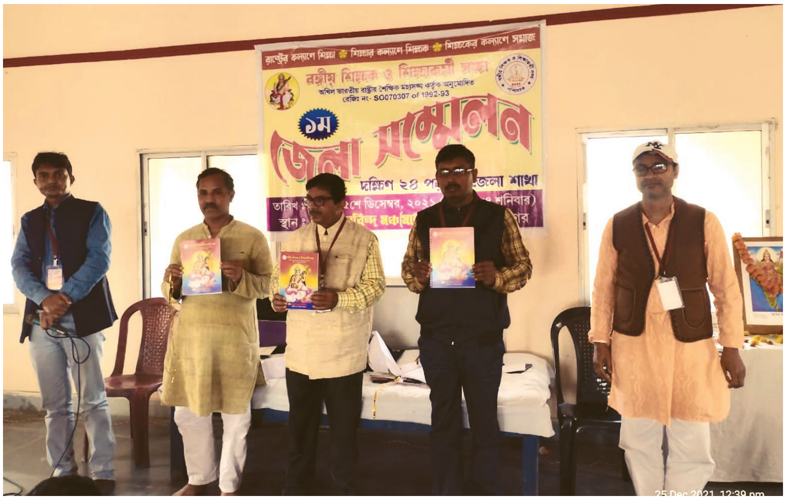

লখনউয়ে সহকার ভারতীর সপ্তম রাষ্ট্রীয় অধিবেশন

গত ১৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউ শহরের রাজ্য পলিটেকনিক কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয় সহকার ভারতীর সপ্তম রাষ্ট্রীয় অধিবেশন। অধিবেশনে দেশের ২৭টি প্রদেশের ৬০০ জেলা থেকে ১ হাজার মহিলা সহ ৪ হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে ৬৭ জন মহিলা-সহ ২১৩জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তিনদিনের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রথম কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী, কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিমন্ত্রী সন্তোষ গাংওয়ার। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভারম্ভ করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

সহকার ভারতীর রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক ড. উদয় যোশী তাঁর স্বাগত বক্তব্যে প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রক তৈরি করা তাঁর একটি বিশেষ উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, সহকার ভারতীর সপ্তম অধিবেশন দেশের সমবায় আন্দোলনকে নতুন দিকনির্দেশ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অমিত শাহ বলেন, সমবায়ে প্রাথমিক সদস্যদের প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিগগিরই সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভাইয়াজী যোশী বলেন, সমবায়ের মূলমন্ত্র হলো সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করা। একজন সুদক্ষ কার্যকর্তাই পারে সংগঠনকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে।

উল্লেখ্য, অধিবেশন চত্বরে বিভিন্ন রাজ্যের সেলফ হেলফ গ্রুপের মহিলাদের তৈরি বিভিন্ন রকমের পণ্যে সজ্জিত তিন শতাধিক স্টল বসেছিল। পশ্চিমবঙ্গের ১৩টি স্টল ছিল।

মকর সংক্রান্তি ভারতীয় সংস্কৃতির একাত্মদর্শন

মন্দার গোস্বামী

সনাতন সংস্কৃতির অন্যতম পবিত্র উৎসব মকর সংক্রান্তি উৎসব। সমগ্র ভারত যখন উত্তুরে হাওয়ার তীব্র প্রভাবে জবুথবু হয়ে অলস দিন কাটায়, তখন শীত বিদায়ের বার্তা নিয়ে প্রকৃতিতে নতুন প্রাণ স্পন্দন সঞ্চার করে ভারতীয় জীবনে আসে মকর সংক্রান্তি। ভারতবর্ষ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার দেশ নয়, ভারতবর্ষ বিজ্ঞানের দেশও বটে। টাইকোব্রাহে, গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটনেরও বহু পূর্বে, হাজার হাজার বছর আগেও বিজ্ঞান চেতনা সম্পন্ন ভারতীয় ঋষি-মুনিরা গ্রহ-নক্ষত্রের সঞ্চারপথ সম্পর্কে বিশদভাবে জানতেন। তাঁরা জানতেন যে সূর্য স্থির, আর তাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী নিরন্তর ভ্রমণ করে চলেছে। তাঁরা এই ভ্রমণকালকে ১২টি রাশিতে ভাগ করে প্রতিটি রাশির একটি করে নামকরণ করেন। আজকের দিনে সূর্যের মকর সংক্রমণ ঘটে, অর্থাৎ রবি ধনু থেকে মকর রাশিতে প্রবেশ করে। যে সূর্য এতদিন মকর ক্রান্তি রেখার ওপর লম্ব ভাবে কিরণ দিচ্ছিল, দক্ষিণায়ন শেষ হয়ে এবার তার উত্তরায়ন শুরু হয়। উত্তর গোলার্ধ থেকে ক্রমশ সূর্যের কাছে আসতে থাকে। আলোক, উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। অন্ধকার, শৈথিল্য, জড়তা মুক্ত হয়ে জীবকুল নবআনন্দে জেগে ওঠে। ভারতীয় সমাজ চিরকালই আলোক রূপী সত্য, জ্ঞান, অমৃতের উপাসক। সেই কোনকালে ভারতীয় ঋষিগণ উদাত্ত কণ্ঠে বলে গিয়েছেন— 'অসতো মা সদ্গময়, তমশঃ মা জ্যোতিঃর্গময়', অর্থাৎ অসত্য থেকে সত্যের পথে, অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে চল। তাই সৌরবছর নিয়ন্ত্রিত মকর সংক্রান্তি, শুধুমাত্র বিজ্ঞান নয়, আধ্যাত্মিকতার দিক থেকেও অতি গুরুত্বপূর্ণ দিনটি। পৌরাণিক মতে আজকের দিনেই ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট মা গঙ্গা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণ করে সগররাজের ভস্মীভূত ষাট হাজার পুত্রকে পবিত্র গঙ্গাস্পর্শে অভিশাপ মুক্ত করেন এবং গঙ্গাসাগরে

মিলিত হন। তাই স্নান মাহাত্ম্যের দিক থেকেও দিনটি অতি পবিত্র। সারা বিশ্ব থেকে কোটি কোটি নর-নারী তীব্র শীত উপেক্ষা করে পুণ্যস্নানের আশায় গঙ্গাসাগরে আসেন। আসেন পুণ্য কুম্ভ স্নানে। বহু ভাষাভাষী, খাদ্য, বস্ত্র বিবিধতায় ভরপুর ভারতীয় সমাজে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে। এই উৎসবের মধ্যে দিয়েই সমগ্র বিশ্ব সনাতন ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করে থাকে। শুধুমাত্র পুণ্য কুম্ভ বা গঙ্গাসাগরে নয়, এই দিনে ভারতবর্ষের প্রায় সমগ্র অংশেই ভিন্ন ভিন্ন নামে এই উৎসব পালিত হয়।

পৌষ মাসের শেষ দিন বলে বাঙ্গলায় পৌষ সংক্রান্তি, অসমে ভোগালি বিহু, বিহার উত্তরপ্রদেশে খিচুড়ি, পঞ্জাব-হরিয়ানায় লোরী, কাশ্মীরে সাঁকরাত, গুজরাটে উত্তরায়ণ, কর্ণাটকে মকর সংক্রমণ, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরলে মকর সংক্রান্তি, তামিলনাড়ুতে পোঙ্গল ইত্যাদি বিভিন্ন নামে এই উৎসব পালিত হয়। শুধুমাত্র এদেশেই নয়, বিদেশেও এই উৎসব পরম শ্রদ্ধা ও উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। নেপালে মাঘী, থাইল্যান্ডে সংক্রান, লাওসে পি-মা-লাও, মিয়ানমারে থিং-ইয়াল এবং কম্বোডিয়ায় মহাসংক্রান নামে পালিত হয়। পুরাণ মতে এই দিনেই দেবাসুরের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। শাস্ত্রমতে দক্ষিণায়নের ছ' মাস তাঁরা জাগ্রত থাকেন। সুতরাং উত্তরায়ণের শুভ সূচনায় নিদ্রোত্থিত দেবতাদের বন্দনায় মুখরিত হয় মানব সমাজ। চতুর্দিকে বেজে ওঠে শঙ্খ, ঘণ্টা, শুরু হয় হোম, যজ্ঞ, পূজা, গীতা পাঠ, কীর্তন, তর্পণ, দান। শাস্ত্র অনুযায়ী মকর সংক্রান্তির দিনে যজ্ঞের আহুতি গ্রহণের জন্য দেবতারা মর্ত্যে নেমে আসেন। আবার এই পথেই পুণ্যাত্মারা শরীর ত্যাগ করে স্বর্গলোকে প্রবেশ করেন। তাই মহাভারতে আমরা দেখি দক্ষিণায়ন কালে আটান্নদিন শরসজ্জায় শায়িত পিতামহ ভীষ্ম এই বিশেষ দিনটিতেই স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। মকর সংক্রান্তির অপর একটি নাম তিল সংক্রান্তি। এই দিনে তিল দিয়ে তৈরি করা নাড়ু, মিষ্টি, ফল ইত্যাদি পূজার নৈবেদ্য হিসেবে নিবেদন করা হয়। এছাড়াও নতুন ফসল ওঠার আনন্দে নানা জাতের পিঠা, পায়েস ইত্যাদির আয়োজন করে দিনটি আরও আনন্দদায়ক করে তোলা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দিনটিকে একাত্ম জাতীয়তাবোধের প্রতীক রূপে পালন করে।

কৌশিক রায়

রামায়ণ মাহাত্ম্য—নানা রূপে, নানা যুগে

আদিকবি বাল্মীকির 'শালপ্রাংশু মহাভুজং' বা কবি কৃত্তিবাস ওঝার 'নব জলধর শ্যাম'— দাশরথি ও ইক্ষ্বাকুবংশতিলক রামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালন, নিঃস্বার্থ মানসিকতা ও লঙ্কেশ্বরদমন, বৈদেহী সীতাদেবীর অটুট পতিভক্তি, সৌমিত্রি লক্ষ্মণের অনুপম ভ্রাতৃভক্তি এবং বীর, মারুতি হনুমানের অকুতোভয়তা— রামায়ণ যেন তার চিরায়ত মহাকাব্যীয়তার সাহিত্যিক পরিসর অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে আপামর ভারতবাসীর কর্মে-স্বপনে-চিন্তায়-মননে। সেই রামায়ণকে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন কম্বন, সন্ধ্যাকর নন্দী, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, তুলসীদাস, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজশেখর বসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো কৃতবিদ্য মনীষীরা। তবে ভারতীয় উপমহাদেশের পরিধি ছাড়িয়ে রামায়ণী ঐতিহ্য স্নিগ্ধ করেছে দূরদূরান্তের অঞ্চলসমূহ ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকেও।

সম্প্রতি দক্ষিণ ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে রামায়ণ বাহিনীর নবরূপায়ণ নিয়ে 'The Multivalence of An Epic' নামক একটি প্রামাণ্য তথ্যভিত্তিক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন পারুল পণ্ডা ধর। বইটিতে কর্ণাটকে পঞ্চম খ্রিস্টীয় শতকের পরবর্তী সময় থেকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের স্থাপনার আগে রামায়ণের কেন্দ্রীয় চরিত্র রামের সঙ্গে সেই সময়কার মহারাজাদের শাসনপ্রণালী ও ব্যক্তিত্বের তুলনা করা হয়েছে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া-তে রাজামঙ্গৎ, দ্বিতীয় সূর্যবর্মণের মতো রাজাদের সঙ্গে দিব্যশক্তিধারী রামচন্দ্রের কীভাবে তুলনা করা হয়েছে— সেটা দেখিয়েছেন ভারত ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণাকারী ইংরেজ বুদ্ধিজীবী জন ব্রকিংটন। খ্রিস্টীয় নবম শতকে জাভা, বোর্নিও ও মালয় উপদ্বীপে রামকে দেশনায়ক এবং রাবণকে প্রতিনায়ক করে যে কাব্য ও নৃত্যনাট্যগুলি রচিত হয়েছিল, তার বিবরণও দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। বালিদ্বীপে রাম-রাবণ দ্বৈরথ নিয়ে রচিত ও প্রদর্শিত নৃত্যনাট্যগুলি নিয়ে অবশ্য এর আগে আলোচনা করেছিলেন 'জাভা যাত্রীর ডায়েরি' নামক ভ্রমণকাহিনিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য তথা যশস্বী সংগীতশিল্পী শান্তিদেব ঘোষ। মায়ানমারে বৌদ্ধ সংস্কৃতি থাকলেও সেই দেশের পেগু, আকিয়ার এবং প্রোম এবং মান্দালয়ে কারেন ও শান উপজাতীয় মানুষ ও প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে নতুন আঙ্গিকে রামায়ণ চর্চা প্রচলিত আছে। এই দেশের দুই রাজা বোদোপায়া ও থি-ব-ও রামায়ণী কথার ও ঐতিহ্যের গুণগ্রাহী ছিলেন। মায়ানমারের এই রামায়ণ প্রিয়তাই পরবর্তীকালে কোচবিহার, ফালাকাটা বক্সা ও ডুয়ার্সের 'কোচ' জনজাতির মানুষদের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে বিস্তৃত হয়।

তামিলনাড়ুর অন্তর্গত কাঞ্চীপুরমে প্রতিষ্ঠিত পল্লব রাজবংশের উদ্যোগে রামচন্দ্রকে দেবতা বিষ্ণুর অবতার রূপে সম্মান জানিয়ে, বিভিন্ন মন্দিরের গাত্রে পাথর খোদাই বা রিলিফ হিসেবে স্থাপনা করা হয়। কেরল ও অন্ধ্রপ্রদেশের চোল রাজবংশের রাজা রাজেন্দ্র চোল এবং রাজরাজ চোলের উদ্যোগেও রামায়ণের জনপ্রিয়তা ঘটে।

রামায়ণের বিশ্বায়ন নিয়ে গবেষণা করছেন র‍্যাচেল ল্যোইজ্যুও। তিনি জানিয়েছেন— কম্বোডিয়াতে খেমের রাজবংশের শাসনকালে এবং দ্বিতীয় সূর্যবমর্ণের দ্বারা আংকোরভাট বিষ্ণুমন্দিরটি গড়ে ওঠার সময় দশম থেকে দ্বাদশ খ্রিস্টীয় শতকের কম্বোডিয়াতে রামায়ণকে নিয়ে পথনাটিকা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই ব্যাপারে রামায়ণের 'যুদ্ধকাণ্ড'র ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন খেমের নৃপতিরা। অবশ্য খেমের যুগে রামায়ণের বিস্তৃতি কতটা হয়েছিল সেই ব্যাপারে ততটা সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের পাল্লাদাকালে নির্মিত একটি মন্দিরের রিলিফ ভাস্কর্যে সোনার হরিণ বেশী মারীচকে শর নিক্ষেপকারী

কম্বোডিয়াতে রামায়ণী নৃত্যনাট্য।

রামচন্দ্রের সৌষ্ঠবযুক্ত মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের ভাস্কর্যকে অশুভ শক্তি বা 'মার'-এর হাত থেকে উদ্ধারের উপায় বলেও মনে করতেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা। চোল ও বিজয়নগর (হাম্পি, কর্ণাটক) সাম্রাজ্য রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের যে ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলির তুলনামূলক গবেষণা করেছেন ইতিহাসবিদ ও ধাতুবিদ্যা বিশারদ সারদা শ্রীবিনাসন।

জাভা, থাইল্যান্ডের অন্তর্গত (পূর্বতন সিয়াম) ব্যাংকক, আয়ুত্থিয়া (থাই নিবাসীদের মতে এটিই আসল অযোধ্যা), পাট্টাইয়া ও চিয়াং মাই অঞ্চলগুলোতে রামের পাশাপাশি বীর ও প্রভুভক্ত হিসেবে বজরঙ্গবলী হনুমানেরও পূজা প্রচলিত ছিল। থাইল্যান্ডের অধিকাংশ মানুষ এখনও মনে করেন রাজা উ-থন এবং তাঁর পুত্র চোলোলাং খোরোন-ই আসল রাজা দশরথ ও রামচন্দ্র। থাইল্যান্ডের পূর্বতন নৃপতি ভূমিবল আদুলাইয়েদেজকেও রামচন্দ্রের উত্তরসূরী বলে মনে করা হতো।

যোড়শ ও সপ্তদশ খ্রিস্টীয় শতকে 'নায়ক্কান' বংশীয় নৃপতিদের উদ্যোগে তামিলনাডুতে রামায়ণ চর্চা ও অযোধ্যার রাজকুমার রামচন্দ্রের উপাসনা কাব্যটি লেখেন তামিল কবি কম্বন। তামিলনাডুতে সপ্তম থেকে নবম খ্রিস্টীয় শতকের মধ্যে 'আলোয়ার' ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের উদ্যোগে রামায়ণী ঐতিহ্য ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি পুতুলনাচের মাধ্যমে রামায়ণের প্রচলন হতে থাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে। সেই ট্র্যাডিশন এখনও অব্যাহত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, থাইল্যান্ডের রামায়ণ (থাইরামাকিয়েন)-এর ভাবনার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের রামায়ণী কথার সাদৃশ্য আছে। থাইল্যান্ডে রামায়ণ ঐতিহ্যের মূল হোতা ছিলেন 'চক্রী' রাজবংশের রাজা প্রথম রাম বা ফ্রা বুদ্ধ ইয়োদ্‌ফা চুলালোক। ১৭৮২ থেকে ১৮০৯ সালের মধ্যে তিনি রাজত্ব করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্রকে প্রতারিত করার জন্য এক রাক্ষসীকে সীতা সাজিয়ে তাকে হত্যা করেছিলেন দশানন। থাই রামায়ণেও বেনজাকাই বা শ্রীজেতী নামে এরকমই এক ছলনাময়ী রাক্ষসীর নাম পাওয়া যায়। দশম শতকে রাজশেখর রচিত 'বলরামায়ণ'-এও এই ধরনের রাক্ষসীর কথা আছে। কেরলের মালয়ালম সাহিত্যে জানকী সীতাকে রামচন্দ্রের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখিয়েছেন ঊনবিংশ শতকের কবি কুমারান আসান তাঁর 'চিন্তাবিষ্টাইয়া সীতা' কাব্যতে। বলিদ্বীপের নৃত্যনাট্য 'কাক্কাউইনা রামায়ণ'-এও সীতাদেবীকে নিষ্কলুষ, বিশ্বায়িত নারীশক্তির প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকে কথাকলি নৃত্য-আঙ্গিকের কাব্য, মালয়ালম ও সংস্কৃত ভাষাতে রচিত 'রাবণোদ্ভাবম'-এ রামায়ণের স্বরূপ সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা দেন কাল্লাইকুলাঙ্গরা রাঘব পিশারোতি। মুসলমান হয়েও মালয়েশীয় নাট্যকার গুলাম সারওয়ার ইউসুফ 'উয়াইয়াং কুলিত কেলাস্তান' নামক নাটকে রামরাজ্যকে সুন্দর ও ধর্মনিরপেক্ষভাবে উপস্থাপিত করেছেন। রাবণের চরিত্র নিয়েও মালয়েশিয়াতে লেখা হয়েছে 'হিকাইয়াৎ মহারাজা রাও-ওয়ানা' শীর্ষক নাটকটি।

মালয়েশীয়রা বাল্মীকির পাশাপাশি কৃত্তিবাস ও তুলসীদাসকেও রামায়ণের রূপকার হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মালয়েশীয় রামায়ণে বিশ্বের প্রথম মানব— আদম (অ্যাডাম)-এর সঙ্গে স্বর্ণলঙ্কাতে রাবণের সাক্ষাতের কথা লেখা আছে। সুফি মতবাদেও বন্দিত হয়েছেন কৌশল্যাতনয়, সীতাপতি রামচন্দ্র। সন্ত কবীর ও মালিক মোহাম্মদ জায়সির লেখাতেও রামচন্দ্রের নিষ্ঠা ও পিতৃসত্য পালনের প্রশংসা আছে। রামচন্দ্রের অস্তিত্ব বিদ্রোহী কবির গীতিমাধুর্যের মধ্য দিয়ে যেন আবার প্রবিষ্ট হয় আমাদের অন্তঃকরণে—

'অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্র
যে জানকীর পতি,
তার-ও হলো বনবাস
রাবণ করে দুর্গতি।
আগুনেও মিটিলো না
ললাটের-ও লেখা, হায়!'

পাট্টাডাকালে বিরূপাক্ষ মন্দিরে রাম-ভাস্কর্য।

স্বামীজীর বৈজ্ঞানিক মানস

সৌমেন নিয়োগী

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর হলিস্টিক ফিলোজফি বেদান্তে বলতে চেয়েছেন যে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার একটি Holystic Universe-এর দিক নির্দেশ করছে যেখানে Matter, energy and consciousness ওতপ্রোত ভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত একটি সাধারণ পটভূমির উপর, যা বেদান্ত অনুসারে সৎ, চিৎ ও আনন্দ। তিনি বিজ্ঞানকে শিকাগো পার্লামেন্টে বলেছেন— 'Science as nothing but the finding of unity.' এবং পশ্চিমে এর উত্তরে তিনি এও বলেছেন, 'One man contents the whole universe' one particle of matter has all the energy of the universe at its back.' বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ স্বামীজীর সেই চিন্তাধারারই প্রকাশ লক্ষ্য করছে, যেখানে প্রত্যেক স্বতন্ত্র বস্তুই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে অভেদ্যভাবে সম্পর্ক যুক্ত। বিখ্যাত পদার্থবিদ্ Fritjof Capra তাঁর গ্রন্থ 'Tao of physics'-এ বলেছেন, 'Micro Cosmos is inseperable from the macro cosmos the whole.' যেমনটি মহাসমুদ্রের একটি তরঙ্গ সমগ্র সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত, Quantum Mechanics বা Wave Mechanics-এর প্রবক্তা Erwin Schodienger তাঁর 'Mind and Matter' গ্রন্থে আত্মা=ব্রহ্ম বলেছেন এবং 'Plurality of consciousness' কে মায়া বলে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। জড় থেকে চৈতন্যের যে যোগ স্বামীজী উপলব্ধি করেছেন, আধুনিক বিজ্ঞান তা দেখতে সক্ষম হয়েছে। Max Born তার 'Probability Wave' তত্ত্বে প্রমাণ করেন, 'Inorganic matter also behave like organic life having consciousness' আইনস্টাইন প্রবর্তিত Steady state universe কালেই রূপান্তরিত হলো singularity-তে। যখন আবদাস সালাম, Glashow, Neinbarg প্রমাণ করেন 'the fundamental unity of all physical forces of universe'—এর নিরিখে David Bohem Bells' Theorem, প্রমাণ করে উপস্থাপন করেন That the universe is fundamentally interconnected and inseparable.

পরবর্তী সময়ে ভারতীয় মনীষায় বিকশিত আর এক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেন যে জড় ও জীবের মধ্যে প্রবহমান একই চৈতন্য যা জীবে উজ্জীবিত বা Active এবং জড়ে নিস্প্রভ বা recessive. কাজেই বিজ্ঞান যতই অগ্রগতি করুক সে তার বিশেষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের পরীক্ষার দ্বারা চেষ্টা করবে সত্যকে জানার। সেইরূপ আধ্যাত্মিকতা সমান্তরালভাবে সেই সত্যের লক্ষ্যে তার দর্শন প্রকাশিত করবে।

পরিশেষে এইটুকু বলা যায় চৈতন্য মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত নয়। চৈতন্য সর্বব্যাপী, তাই আগামী বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ সেই energy and conscиouness-এর অন্তর্নিহিত একত্রীকরণের অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করা। ভারতীয় ঋষি প্রজ্ঞায় যা সহস্র বছর ধরে দীপ্ত, পরাধীনতায় তামসিক আচ্ছন্ন ভারতবাসীকে স্বামীজীর এই বাণী এবং উপলব্ধিতা আমাদের আগামী দিনে বিজ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। ▯

গ্রেগগ্রিয়ান ক্যালেন্ডারের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই

পিন্টু সান্যাল

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ব্যাপকতা এবং বিভিন্ন কারণে এর বিশিষ্টতা এক বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের সুযোগ এনে দেয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস যেমন প্রাচীন তেমন ঘটনাবহুল। ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা এবং বেদ-উপনিষদ তার প্রাচীনতম সাহিত্য। বেদ-উপনিষদকে পশ্চিমি বিশ্ব ইতিহাস বলে স্বীকার না করলেও ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে স্বীকার করেছে। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের নিজস্বতা আছে। প্রত্যেক ঘটনা শ্লোকের আকারে লিপিবদ্ধ করার সময় সেসময়ের চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে যা থেকে একদিকে যেমন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে জানা যায়, অন্যদিকে ঘটনাগুলোর কালনির্ণয়ে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে আসা যায়। সুতরাং কালনির্ণয় ইতিহাসের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে সভ্যতা যত আগে কালনির্ণয়ের পদ্ধতি ও লিপির ব্যবহার শিখেছে, সেই সভ্যতা তাদের ইতিহাস তত আগে থেকে লিপিবদ্ধ করেছে। কালনির্ণয় ও লিপির ব্যবহার তাই কোনো একটি জাতির সভ্যতার প্রাথমিক শর্ত হয়ে দাঁড়ায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার কালনির্ণয়ের ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে সেই সভ্যতার বিজ্ঞানের ইতিহাস, সেই সভ্যতার প্রাচীনত্বের প্রমাণ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপের বর্তমান অগ্রগতি, কালনির্ণয়ের ইতিহাস জানতে আমাদের আগ্রহের উদ্রেক করে এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাতো এই ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের অবদান কী তা আমাদের জানা প্রয়োজন।

আমাদের জন্মদিন আমাদের প্রত্যেকের কাছে খুব প্রয়োজনীয় এবং তা আমাদের পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আজ যদি প্রশ্ন করা হয়, আপনার জন্মদিনের যে তারিখটি আপনি ব্যবহার করেন সেটি কি ঠিক? সেই তারিখ যে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ঠিক করা হয়, তার কি কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে? আমরা সাল-তারিখ উল্লেখ করি খ্রিস্টাব্দের ভিত্তিতে। অর্থাৎ যে কোনো ঘটনার তারিখ নির্ধারণ করা হয় যিশুখ্রিস্টের জন্মের সময়কে একটি নির্দিষ্ট দিন ধরে নিয়ে। কিন্তু যিশুখ্রিস্টের জন্মদিনটি কি নির্দিষ্ট? তার কি কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে? যিশুর জন্মদিন ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঠিক করা হয়েছে। অর্থাৎ তার তথাকথিত জন্মদিনের ছশো বছর পরে, যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বিশ্বের কাছে এখনোও অজানা। ইংরেজিতে সাল উল্লেখ করতে AD বা BC দেওয়া হয়, যেমন 2020 AD। অর্থাৎ Anno Domini, যার অর্থ ইয়ার অব লর্ড। এখানে লর্ড কে?

যারা তথাকথিত সেকুলারিজমের প্রবক্তা তাঁদের কাছে প্রশ্ন, তারিখ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কেন কোনও একটি উপাসনা পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে? ভারতবর্ষের কালনির্ণয়ের কোনও নিজস্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি নেই? ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের সভ্যতা কি নিজস্ব কালপঞ্জী ছাড়াই বিকশিত হয়েছিল? আসলে আমরা যে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি তা আমাদের স্বাধীন দেশে ঔপনিবেশিকতার সরচেয়ে বড়ো প্রমাণ। অন্যদিকে ভারতীয় কালগণনা পদ্ধতি একই সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন বিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতা এবং ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানের ইউরোপে স্থানান্তরণ বা আরও স্পষ্ট করে বললে চৌর্যবৃত্তির এক অকাট্য প্রমাণ।

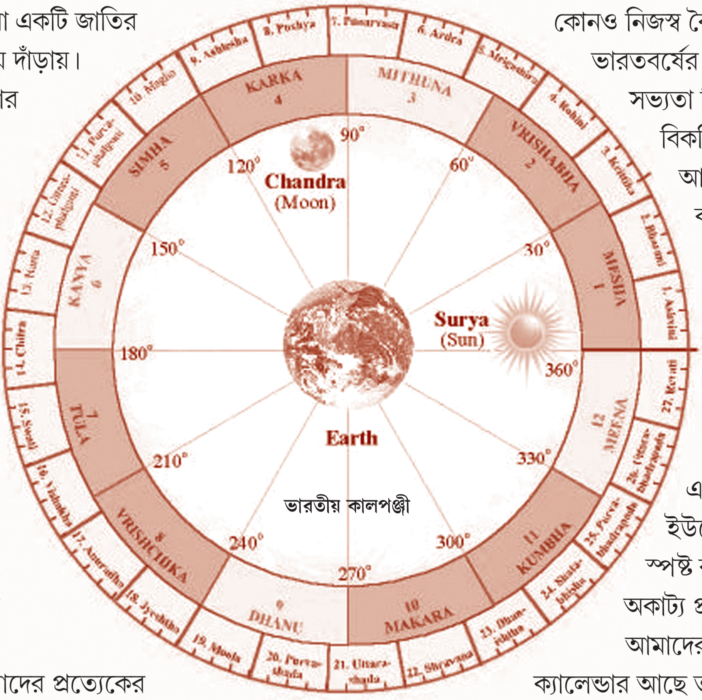

আমাদের প্রত্যকের বাড়িতে যে ক্যালেন্ডার আছে তাকে পোপ গ্রেগরির নামানুসারে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার বলা হয় । গ্রিক

ফঃ ৫

ঐতিহাসিক হেরোডেটাসের মতে গ্রিকরা তাদের ক্যালেন্ডার মিশরীয়দের থেকে অনুকরণ করেছিল। কিন্তু গ্রিক ও রোমান উভয়েই সেই নকল করা ক্যালেন্ডারের সঙ্গে ঠিকমতো মানিয়ে নিতে পারেনি। কারণ তাদের পাটিগণিতে অজ্ঞতা। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৪৮ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে জুলিয়াস সিজার মিশর দখল করেন এবং মিশরীয় জ্যোতির্বিদ সসিজিনিসের সহায়তায় ৪৬ খ্রিস্টপূর্বব্দে অনেক ধোঁয়াশা নিয়েও ক্যালেন্ডার সংশোধন করেন। সংশোধিত ক্যালেন্ডাকে পৃথিবীর জলবিষুব বা মহাবিষুবের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে ৪৪৫ দিনের হেরফের হচ্ছিল। মিশরীয়রা রোমানদের পাটিগণিতের অজ্ঞতা সম্পর্কে জানতো এবং বুঝতে পেরেছিল যে রোমানরা মাসের হিসাবকে চাঁদের বিভিন্ন দশার সঙ্গে মেলাতে পারবে না। সেজন্য তারা রোমানদের একটি সহজ ক্যালেন্ডার দিয়েছিল যাতে মাসের সঙ্গে চাঁদের দশার কোনো সম্পর্ক ছিল না। সসিজিনিসের ক্যালেন্ডারের ৭ মাসের দিনসংখ্যা ৩১ রাখা হয়েছিল যেখানে প্রত্যেক ৪ বছর পর একটি লিপ ইয়ারের কথা বলা হয়।

রোমানরা এই ক্যালেন্ডারের কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে নিজেদের দখলে নিয়ে জুলিয়াসের নামে এই ক্যালেন্ডারের নামকরণ করে এবং একটি মাসের নাম জুলাই রাখে। কিন্তু তারা সসিজিনিসের সাধারণ নির্দেশ বুঝতে না পেরে ৩ বছর পর পর লিপ ইয়ার যুক্ত করতে থাকে। এই ভুল অগাস্টাসের সময় সংশোধন করা হয় এবং তাঁর দাবি অনুসারে একটি মাসের নাম অগাস্ট রাখা হয়। জুলিয়াসকে অনুসরণ করে তিনিও অগাস্ট মাসের দিনসংখ্যা ৩১ করে দিলেন। জুলাই ও অগাস্টের এই অতিরিক্ত দুইদিন ফেব্রুয়ারি থেকে কাটা হলো। রোমান ক্যালেন্ডারে বিভিন্ন মাসের দিনসংখ্যা হলো ২৮, ২৯,৩০ ও ৩১, যার সঙ্গে চাঁদের দশার কোনো সম্পর্ক নেই এবং কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। এর থেকেই কি গ্রিক ও রোমানদের অজ্ঞতা প্রমাণ হয় না? কারণ তারা চাঁদের বিভিন্ন দশার হিসাব রাখতেই জানতো না। এমনকী রোমানরা সূর্যের ঋতুচক্রের হিসাব রাখতেও জানতো না।

৪ বছর পর লিপ ইয়ারের হিসাব অনুযায়ী প্রত্যেক বছর হয় ৩৬৫ ১/৪ দিনে। এটা আদৌ ঠিক নয়। যদিও এখনো এটাই আমাদের শেখানো হয়। তাহলে গ্রিক ও রোমানরা কেন এটিকে ভুল করে ৩৬৫.২৫ দিন করল? আসলে গ্রিক এবং পরে রোমানরা ৩৬৫.২৪২- এর মতো একটি সংখ্যাকে লিখতেই জানতো না। কারণ তারা ০.২৪২-এর মতো নিখুঁত ভগ্নাংশ লিখতে পারতো না। রোমানরা কেবলমাত্র ১২-র ভগ্নাংশ লিখতে পারতো। যেমন, ১/১২,২/১২,৩/১২ ইত্যাদি। সেজন্য তারা ৩৬৫.২৫-কেই দিনসংখ্যা হিসেবে বেছে নিয়েছিল।

চতুর্থ শতাব্দীতে চার্চ (Nicene Council) ইস্টারের দিন নির্ণয়ের জন্য জুলিয়ান ক্যালেন্ডারকে নিজেদের উপাসনা সম্পর্কিত কাজের জন্য ব্যবহারের স্বীকৃতি দেয়। তখন খ্রিস্টানদের প্রধান উৎসব ছিল ইস্টার। তখন থেকেই মিশরীয়দের থেকে পাওয়া ক্যালেন্ডার জুলিয়ান ক্যালেন্ডার নামে খ্রিস্টানদের ক্যালেন্ডার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। চার্চের নির্দেশ অনুযায়ী মহাবিষুবের প্রথম পূর্ণিমার পর প্রথম রবিবার ইস্টার হিসেবে ধার্য করা হলো। যদি সেইদিন ইহুদিদের অনুষ্ঠান পাসওভারের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে ইস্টার পরের রবিবারে স্থানান্তরিত হবে। তাই ইস্টারের দিন ধার্য করতে মহাবিষুব ও চাঁদের দশা সম্পর্কে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। রোমান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রতি ১ বছরে মহাবিষুব বা জলবিষুরের দিন ০.১ দিন করে পিছিয়ে যেতে থাকে, অর্থাৎ ১০০ বছরে ১ দিন। তাই ১ শতাব্দীতে ইস্টার ১ দিন করে সরে যেতে লাগল।

এই জন্যই পোপ হিলারিয়াস পঞ্চম শতাব্দীতে ক্যালেন্ডার সংশোধনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু বিফল হলেন। এই বিফলতা জ্যোতির্বিজ্ঞানে ও গণিতে রোমানদের অজ্ঞতাই প্রমাণ করে। যদি সেই সময় গ্রিকদের বহুচর্চিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের আকর গ্রন্থ Aimagest (বলা হয়ে থাকে ২য় শতাব্দীতে Claudius Ptolemy দ্বারা রচিত)-এর অস্তিত্ব আদৌ থাকত, তাহলে ৫ম শতাব্দীতে এই ক্যালেন্ডার সংশেধেনের কাজে কেন ব্যবহার করা হয়নি, তা একটি বড়ো প্রশ্ন। তাই গ্রিকদের জ্যোতির্বিজ্ঞানে দক্ষতার কল্পকাহিনিকে এই ঘটনা মিথ্যা প্রমাণ করে।

অন্যদিকে ভারতবর্ষে যে কোনো ভগ্নাংশ লেখার সঠিক পদ্ধতি জানা ছিল। ভারতবর্ষের জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাই, নক্ষত্রবর্ষের (Sidereal year) দিনসংখ্যা সুনির্দিষ্ট ভগ্নাংশের সাহায্যে ৫ম শতাব্দীতে আর্যভট্টের গীতিকাতে উল্লেখ করা হয়েছে। নক্ষত্রবর্ষের দিনসংখ্যা আর্যভট্ট বলেছেন ৩৬৫. ২৫৮৬। নক্ষত্রবর্ষের বর্তমানে গৃহীত দিনসংখ্যা ৩৬৫.২৫৮৬। আর্যভট্টের গণনা দশমিকের দুই ঘর পর্যন্ত ঠিক ছিল। মনে রাখতে হবে, এটি নক্ষত্রবর্ষের দিনসংখ্যা যা ক্রান্তীয় বছরের থেকে বেশি। তাই ভারতীয় দিন গণনা বলিষ্ঠভাবে প্রমাণ করে যে, গ্রিক ও রোমানদের তুলনায় ভারতবর্ষ গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে ছিল।

গ্রিকদের বিজ্ঞানের কৃতিত্বের সমস্ত গল্প দ্বাদশ শতাব্দীর পরের পুঁথির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। পশ্চিমি বিশ্বের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই অজ্ঞতা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে ক্রুসেডের পর থেকে তারা অন্য দেশ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করতে শুরু করে। ভারতীয় গণিতের জ্ঞান দশম শতাব্দীতে আরবের আল খোয়াজমির অনূদিত হিসাব-আল- হিন্দ-এর মাধ্যমে আরবে পৌঁছায়। পশ্চিমি বিশ্ব রোমান অঙ্কের পরিবর্তে আরবের মাধ্যমে ভারতীয় অঙ্ক গ্রহণ করে নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করে নেয়। পোপ সিলভেস্টার ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোবা থেকে ভারতীয় অঙ্ক ইউরোপে নিয়ে গেলেও তার পদ্ধতি বুঝতে পারেনি। ফ্লেরেন্সের বণিকরা ভারতের অ্যালগরিদম বুঝতে পারলেও খ্রিস্টান জেসুইটদের পাঠক্রমে ব্যবহারিক গণিত ক্লভিয়াসের মাধ্যমে

১৫৭২ খ্রিস্টাব্দের আগে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই ক্লভিয়াস ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে ক্রান্তীয় বছরের দিনসংখ্যা পরিবর্তন করে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার সংশোধন করেন। প্রতি ১০০ বছরে লিপ ইয়ারকে বাতিল করে প্রতি হাজার বছরে লিপ ইয়ার করা হয়। তাই এখন ট্রপিক্যাল ইয়ারের দিনসংখ্যা দাঁড়ালো ৩৬৫.২৫-০.০১ + ০.০০১ সমান সমান ৩৬৫.২৪১।

ক্লভিয়াস কী করে এই সংশোধন করলেন? এই সংশোধনের জন্যও তাকে ভারতবর্ষ থেকে আমদানি করা জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। কোনো প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ছাড়া গ্রেগরিয়ান সংশোধনকে প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী ব্রিটেন (নিউটন সহ) তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেনি। নিউটনের মৃত্যুর পর ব্রিটেনে এই ক্যালেন্ডার গৃহীত হয়। অর্থাৎ ইউরোপিয়ানরা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বছরের নির্দিষ্ট দিনসংখ্যা জানতোই না। ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে ক্লভিয়াসের ছাত্র ও জেসুইট গুপ্তচর রিসি (Matteo Ricci) ভারতের কোচিতে ভারতীয় কালগণনা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে ভারতে এসেছিল। রিসির একটি চিঠি থেকে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের তথ্যগুলি ইউরোপে পাচারের কথা জানা যায়।

ক্যালেন্ডারের এই সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। নৌযাত্রার কারণে প্রয়োজনীয় নেভিগেশনের জন্য একটি ভালো ক্যালেন্ডারের প্রয়োজন ছিল। ইউরোপের বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধিশালী হওয়ার স্বপ্ন নির্ভুল নেভিগেশন পদ্ধতি ছাড়া এতদিন অধরা ছিল। নেভিগেশনের প্রথম পদক্ষেপ হলো সমুদ্রে অক্ষাংশ নির্ণয়ের পদ্ধতি জানা। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে এক সামুদ্রিক অভিযানে ব্রিটেনের দু'হাজার নাবিক নিখোঁজ হয়ে যায়। ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নেভিগেশনের সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। ভাস্কো-দা-গামা ও কলম্বাস নেভিগেশন পদ্ধতি জানতো না। ভাস্কোকে কনক নামে এক ভারতীয় নাবিক পথ দেখিয়ে ভারতীয় উপকূলে এনেছিলেন। কলম্বাস ভারতের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে আমেরিকায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। এই হচ্ছে সেই সময়কার ইউরোপের বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা!

সমুদ্রের সঠিক অক্ষাংশ নির্ণয়ের জন্যই পোপ গ্রেগরি ক্যালেন্ডার সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এখনও গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে মহাবিষুব একই দিনে আসে না। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারকে সম্পূর্ণভাবে একটি জাতির আবিষ্কার বলে মেনে নেওয়া যায় না।। কারণ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার রোমান ক্যালেন্ডারের পরিবর্তিত ও সংশোধিত রূপ। আবার রোমানরা এই ক্যালেন্ডার গ্রিসের থেকে পেয়েছিল, যা গ্রিস পেয়েছিল মিশরীয়দের থেকে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ থেকে মিশরে কালগণনা পদ্ধতি পৌঁছেছিল না মিশরেই এর বিকাশ হয়েছিল তার উত্তর এখনো অধরা।

রোমান ক্যালেন্ডারের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য ইউরোপকে ভারতের দিকেই তাকাতে হয়েছিল। আমরা জানি, বর্তমানে কোনো দেশ অন্য কোনো দেশকে উন্নত যন্ত্র রপ্তানি করলে সেই যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণের প্রযুক্তি বিক্রেতা দেশটির কাছেই থাকে বা ওই যন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর জন্য ক্রেতা-দেশটিকে বিক্রেতা-দেশের মুখাপেক্ষী হতে হয়। ক্যালেন্ডারের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আর ভারতবর্ষের কালগণনা পদ্ধতির ক্রমান্বয়ে বিকশিত হওয়ার এক নিজস্ব ইতিহাস আছে যা ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধীরে ধীরে উন্নত হওয়ার ইতিহাস। ভারতবর্ষের কালপঞ্জী ঋকবেদ ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময় থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। ঋকবেদ থেকে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ এবং তার পরবর্তীকাল ভারতীয় জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য পর্যন্ত ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কালপঞ্জীর কয়েক হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলের বিভিন্ন ঋকে সূর্যের উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন অবস্থান (১/২৯/৬, ও ১/২০/৮), ছয়টি ঋতুর (১/১৬৪/১৫ ও ১/৯৫/৩) কথা উল্লেখ আছে। ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলের ঋকগুলি কমপক্ষে ৯০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে রচিত। কিন্তু ঋকগুলিতে বর্ণিত কালগণনা পদ্ধতি তার অনেক আগে শুরু হয়েছিল। ঋকবেদের চতুর্থ, ষষ্ঠ ও নবম মণ্ডলের বিভিন্ন ঋকে চাঁদের বিভিন্ন দশা ও স্থির নক্ষত্রের সাপেক্ষে সূর্য-চন্দ্রের অবস্থান নির্ণয় সম্পর্কে জানা যায়। ঋকবেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, ভারতবর্ষের কালগণনা পদ্ধতি বিশ্বের সব থেকে প্রাচীন। নতুনভাবে সংযোজিত বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময়কাল প্রায় ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ বলে প্রসিদ্ধ

সূর্যসিদ্ধান্তের আগে রচিত কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থের কথা বিশ্বের কোনো দেশে নেই।

ভারতবর্ষের পঞ্চাঙ্গ একটি লুনি সোলার ক্যালেন্ডার যা বছরকে সূর্যের ঋতুচক্র অনুসারে এবং মাসকে চাঁদের দশা অনুসারে হিসেব করে। পঞ্চাঙ্গ অনুসারে একমাসে ৩০টি তিথি থাকে। সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে কৌণিক ব্যবধান ১২ ডিগ্রি হতে যে সময় লাগে তাকে এক তিথি বলে। তিথি ও বর্তমানের দিনের সময়কাল এক নয়। সূর্যের ঋতুচক্র অনুসারে ১ বছর চাঁদের দশা অনুযায়ী ১২ মাসের থেকে কিছুটা বেশি হয়। তাই আর কিছু অন্তবর্তী মাস বা অতিরিক্ত মাসের প্রয়োজন যাকে আমরা মলমাস বলি। আরবীয়রা ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসরণ করলেও তাদের কালপঞ্জী শুধুমাত্র চাঁদের দশার ওপর নির্ভরশীল। বৌদ্ধদের মাধ্যমে ভারতীয় কালপঞ্জী চীনে পৌঁছায়।

প্রাচীন ভারতের সম্পদশালী হওয়ার পেছনে দুটি কারণ ছিল– কৃষি ও অন্য বৈদেশিক বাণিজ্য। এই দুই ক্ষেত্রেই সফলতার জন্য একটি সঠিক কালপঞ্জীর প্রয়োজন ছিল। কৃষিক্ষেত্রে বর্ষাকাল নির্ণয়ের জন্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্যে নেভিগেশনের জন্য। ভারতবর্ষের সমৃদ্ধিশালী অতীত প্রমাণ করে যে এই দেশ বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে এগিয়ে ছিল। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়া একটি নির্ভুল কালপঞ্জী তৈরি করা সম্ভব হতো না আর নির্ভুল কালপঞ্জী ছাড়া কৃষি ও বাণিজ্যে সফলতা কল্পনামাত্র ছিল। যদিও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরা এই সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োগ কোনোদিন করেননি। তাই তাদের লেখায় ভারতবর্ষের কাছে বিশ্ব কতটা ঋণী তা প্রকাশ পায় না।

গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বর্ষা, অতিবৃষ্টি ও খরার পূর্বাভাস প্রায়ই ভুল হতে দেখা যায়। তাই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের ব্যবহার আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধনও করেছ কি না সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। ভারতীয় কালপঞ্জী বর্ষার সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারবে কি না তা পরের প্রশ্ন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছাড়াই এটিকে বাতিল করে দেওয়ার কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। পরানুকরণের এ এক লজ্জাকর দৃষ্টান্ত। বেশিরভাগ মানুষ ভারতীয় কালপঞ্জী অনুযায়ী নিজেদের জন্মদিন বলতে পারেন না। ভারতীয় উৎসবগুলি বেশিরভাগই যেমন দুর্গাপূজা, দোলপূর্ণিমা, বুদ্ধজয়ন্তী, মহাবীর জয়ন্তী, দীপাবলী চাঁদের দশার ওর নিভরশীল যা আমরা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার দেখে বলতে পারবে না। আমাদের ভারতীয় দিনপঞ্জীর ওপর নির্ভরশীল হতেই হয়, কারণ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে তিথি অনুসারে এই দিনগুলি স্থির নয়। খুব দুঃখের বিষয়, বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস পালিত হয় খ্রিস্টান আচারের জন্য প্রবর্তিত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী।

গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার একটি অবৈজ্ঞানিক কালপঞ্জী। শুধুমাত্র এই একটি কারণেই এটিকে বাতিল করা উচিত। কোনো প্রামাণ্য তথ্য ছাড়াই ক্রুসেড-পরবর্তী কল্পকাহিনিগুলিতে বিজ্ঞানে গ্রিক ও ইউরোপিয়ানদের উৎকর্ষতার যে দাবি করা হয় তাকে ভারতীয় কালপঞ্জী সমূলে উৎপাটিত করে এবং একই সঙ্গে ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক সক্ষমতার এক অকাট্য প্রমাণ আমাদের সামনে তুলে ধরে। আমাদের যদি কোনো নির্জন দ্বীপে রেখে দেওয়া হয় তাহলে আমরা বর্তমানে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সাল তারিখ ভুলে যাব, আর একবার ভুলে গেলে সঠিক দিন নির্ণয় অসম্ভব হয়ে যাবে। কিন্তু ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের রীতি অনুযায়ী যে পঞ্চাঙ্গের সাহায্যে কাল নির্ণয় করা হয় সেই পদ্ধতিতে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের অবস্থান জেনে কাল নির্ণয় করা সহজেই সম্ভব। এই থেকেই প্রমাণিত যে সূর্য-চন্দ্রের পর্যায় ক্রমিক গতি এবং নক্ষত্রের অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে তৈরি কালগণনা পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত ক্যালেন্ডারের থেকে অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক। শুধু তাই নয়, অতীতকালের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার সময় সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান থেকে সেই ঘটনাটি বর্তমান সময়ের থেকে কতদিন আগে ঘটেছিল তাও নির্ণয় করা সম্ভব। তাই ভারতীয় কালগণনা পদ্ধতি ভারতীয় সভ্যতার মতোই সনাতন।

বর্তমানে প্রচলিত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের ব্যবহার প্রমাণ করে যে, উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে সারা বিশ্ব তখনই মান্যতা দেয় যখন সেই পদ্ধতির জন্মদাতা-সভ্যতা সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নতুবা বিজয়ীর পদ্ধতিকেই বিজিত জাতি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধের কিছু অংশ উল্লেখযোগ্য– '' গ্রিস একদিন পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার লুটে নিয়ে গিয়েছিল, রোমও তাই করেছিল। আফগানেরাও বড়ো কম করেনি, কিন্তু সেটা সত্যের জোরেও নয়, সত্য হয়েও থাকেনি। দুর্যোধন একদিন শকুনির বিদ্যার জোরে জয়ী হয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে দীর্ঘকাল ধরে বনেজঙ্গলে উপবাস করতে বাধ্য করেছিল, সেদিন দুর্যোধনের পাত্র ছাপিয়ে গিয়েছিল, তার ভোগের অন্নে কোথাও একটি তিলও কম পড়েনি, কিন্তু তাকেই সত্য বলে মেনে নিলে যুধিষ্ঠিরকে ফিরে এসে সারাজীবন কেবল পাশাখেলা শিখেই কাটাতে হতো। সুতরাং জয় করা বা পরের কেড়ে নেওয়ার বিদ্যাটাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই মানুষের বড়ো সার্থকতা নয়।''

এখন আমাদের সামনে প্রশ্ন, আমরা ঔপনিবেশিকতার প্রতীক, খ্রিস্টানদের আচার অনুযায়ী তৈরি করা অবৈজ্ঞানিক গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারকে নিজেদের জীবনের অঙ্গ করব না ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতার প্রতীক বিজ্ঞানসম্মত ভারতবর্ষের নিজস্ব কালপঞ্জীকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিশ্বের সামনে এক গর্বিত ভারতবাসী হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো? □

অতিমারীর সংকটেও বেহালা অনুদর্শীর নাট্যাভিযান

কৃষ্ণচন্দ্র দে

অতিমারীর এই সংকটময় পরিস্থিতিতে নাট্য সমাজ বড়ো কষ্টে আছে। কেউ কেউ অন্য পেশায় কোনোমতে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তার মাঝেও দেখা গেল আলোর ঝলকানি। বেহালা অনুদর্শীর প্রাণপ্রতিমা সুমনা চক্রবর্তী কলকাতা ও জেলা দলগুলিকে নিয়ে দুটি পর্বে নাট্যমেলার আয়োজন করলেন কলকাতা শহরেই। বরাবরই আমি প্রতিভার অন্বেষণে থাকি। কী শহরে কী মফস্‌সলে নাট্যপ্রতিভা দেখলেই পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে ধরার চেষ্টা করি।

কী নাটক রচনায়, বিদেশি নাটকের বঙ্গীয়করণে, স্ক্রিপ্ট রচনায় সুমনা তাঁর মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন বিভিন্ন নাটকের মঞ্চায়নে। সুমনার প্রথম নাটক আমার দেখা 'অমল তাস'। অবশ্য এর আগেও সুমনা বহুদলে আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে নাটকে অভিনয় করেছেন। অমল তাস থেকে শুরু করে ফরটি ফার্স্ট, বড়ো একা লাগে, 'শূন্যমনে', 'মৌনমুখর', 'মুসলমানির গল্প', 'মধ্যবর্তিনী', 'ইতি তোমাদের রথি', 'একনারী কাদম্বিনী', 'মনদাম্পত্য', আহত অম্বা' এবং ওয়েব সিরিজের জন্য 'দ্রৌপদী'। এতগুলো কাজ আমি নিজে দেখেছি বিভিন্ন মঞ্চে। প্রত্যেকটি নাটকে সুমনা তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এর মধ্যে 'মধ্যবর্তিনী' ও 'মুসলমানির গল্প' দু'টি কবিগুরুর কাহিনি অবলম্বনে রচিত। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী হিসেবে সুমনা বিদেশি নাটকের ভাষান্তরেও স্বকীয় প্রতিভা দেখিয়েছেন।

এর মধ্যেই আবার নাট্য অ্যাকাডেমির তৃপ্তি মিত্র সভাঘরে ও তপন থিয়েটারে মোট দু'টি পর্বে দেখতে পেলাম জেলা নাট্যদলের অভিনয়। আমরা শহরবাসীরা জানতেও পারি না যে, শত প্রতিকূলতার মধ্যেও জেলাদলগুলি কী অসাধারণ কাজ করে চলেছে। তৃপ্তি মিত্র সভাঘরে দেখলাম উজান নিবেদিত 'উত্তরাকথা'র অভিনয়ে তুহিনা বসুসেনকে। কোচবিহার মৃত্তিকা নিবেদিত 'রবীন্দ্রনাথ ও পোড়া অন্তর্বাস' অভিনয়ে দেবলীনা সেন। তপন থিয়েটারে দেখলাম অনুদর্শীর নাট্যমেলায় নাট্য ভাবনা (সুন্দরবন) প্রযোজিত নাটক 'পোশাকের রং'। ভাবনা মৌমিতা ধর সাহা এবং ভাটা থিয়েটার প্রযোজিত রুমা সিংহ সম্পাদিত নাটক 'কেউ কথা রাখেনি'। নাট্যমোদী দর্শকবৃন্দ সুমনার এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

'অমল তাস' আধুনিক প্রজন্মের এক নারীর সামাজিক অন্বেষণ। তাতে ও নিজেকে অনেক খোলামেলা চরিত্রে রূপায়ণ করে নিজের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ সমাজে নারীরা ইচ্ছা করলে কতটা পরিবর্তন আনতে পারে সেই বার্তা তুলে ধরেছে।

'শূন্যমনে' ত্যাগ তিতিক্ষার নাটক। এ যেন সুমনার স্বপ্নের উড়ান। নাটকটি মোট পাঁচটি অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছিল। আগুনে পুড়ে যাবার দৃশ্যটি যারা দেখেছে তারা আজও সুমনাকে ভুলতে পারেনি।

'বড় একা লাগে' নাটকে মূর্ত হয়ে উঠলো নারীর বঞ্চনার হাহাকার। সুমনার অভিনয় দর্শকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। তরুণী মেয়ের বৃদ্ধার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয়। একবারের জন্যও মনে হয়নি সুমনা অভিনয় করছে। উষাদি, সীমা ও অর্পিতার পাশাপাশি নাট্যজগতে আরও একটি নাম সংযোজিত হলো মহিলা নির্দেশক হিসেবে। এর আগে সুমনাকে বৃদ্ধার ভূমিকায় দেখা যায়নি। ও যেন ধীরে ধীরে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে। মধ্যবর্তিনী ও মুসলমানির গল্পেও তাই দেখেছি। 'ফরটি ফার্স্ট' নাটকের প্রেক্ষাপট রাশিয়ার জারের রাজত্বের শেষের দিক।

এক নারী কাদম্বরীতে সুমনা এক ঘণ্টার জন্য আমাদের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে পৌঁছে দিয়েছে। সুমনার একক অভিনয় দেখলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। 'ইতি তোমাদের রথী' নাটকে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে রচিত নাটক। রবিঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালি খুব ভালো করে জানে না। সুমনার দৌলতে দর্শকরা জানতে পারলো। বিশ্ব ভারতীর উপাচার্য হিসেবে তাঁর কাজ, তর্ক-বিতর্ক, শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা, সবই এসেছে। সেইসঙ্গে এসেছে সকল সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে নেহরুর সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে দেরাদুনে চলে যাওয়া। আহত অম্বায় পাণ্ডবানীর মতো একক অভিনয় সুমনাকে নাট্যসমাজে অকুণ্ঠ প্রশংসাও বিশেষ স্থান দিয়েছে।

এই ভাবেই সুমনা এগিয়ে চলেছে। এটা ওর একক লড়াই। সুমনা নাটককে ভালোবেসে সংসার করেনি, কারণ নাটকই তার ধ্যানজ্ঞান ও ভরসার জায়গা। সুমনা হয়তো এখনো অঙ্কুরে আছে, কিন্তু একদিন ও বিশাল মহীরুহে পরিণত হবে, এ আমার বিশ্বাস।

গঙ্গার মর্ত্যে আগমন

একশো অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ হলেই সগর রাজা ইন্দ্রের সমকক্ষ হয়ে স্বর্গের রাজা হবার যোগ্য হবেন। আর একটি যজ্ঞ শেষ হলেই সগর রাজার একশোটি যজ্ঞ পূর্ণ হয়। এই কারণে ইন্দ্রের মনে বড়ো ভয় হলো। তাই যখনই শেষ যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হলো, তখন ইন্দ্র গোপনে ঘোড়াটি চুরি করে পাতালদেশে নিয়ে গেলেন এবং কপিলমুনি যে স্থানে বসে ধ্যান করছিলেন সেই স্থানে ঘোড়াটিকে জঙ্গলে বেঁধে রেখে চলে গেলেন। কপিলমুনি এসব ব্যাপারে কিছুই জানতে পারলেন না।

সগরের পুত্ররা খুঁজতে খুঁজতে কোথাও ঘোড়া না দেখতে পেয়ে অবশেষে পাতালের দিকে যেতে লাগলেন এবং পাতালে উপস্থিত হয়ে কপিলমুনির আশ্রমে বেঁধে রাখা অবস্থায় দেখে মনে করলেন যে, এই মুনিই ঘোড়াটি ধরে রেখেছেন। তখন তাঁরা চোর মনে করে মুনিকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। মুনির ধ্যানভঙ্গ হলো। তিনি ক্রুদ্ধ নয়নে তাকাতেই রাজপুত্রেরা ভস্মীভূত হয়ে গেলেন।

এদিকে এক বছর শেষ হতে চলল, তবু সগরের পুত্রেরা যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে ফিরলেন না। তখন সগর তাঁর পুত্র অংশুমানকে অশ্বের সন্ধানে পাঠালেন। অংশুমান পাতালে উপস্থিত হয়ে কপিলমুনির আশ্রমে অশ্বটি দেখতে পেলেন। তিনি তখন মুনির কাছে গিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে পিতৃব্যদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। মুনি বললেন, আমার কোপেই তোমার তারা ভস্মীভূত। অংশুমান কাতর হয়ে মুনিকেই তাঁদের উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। মুনি বললেন, যদি স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে আনতে পার, তাহলে সেই পবিত্র জল তাদের ভস্মের ওপর পড়ামাত্র তাঁরা মুক্তি পেয়ে যাবে। এই বলে তিনি অংশুমানকে যজ্ঞের ঘোড়া ফেরত দিলেন। সগর রাজা ঘোড়া পেয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন বটে, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনতে পারলেন না। সগরের পর অংশুমান ও তাঁর পুত্র অনেক তপস্যা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। দিলীপের পর তাঁর পুত্র ভগীরথ অযোধ্যার রাজা হলেন। রাজা হয়েই তিনি তপস্যায় গেলেন। বহু বছর কঠোর তপস্যার পর ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে এলেন। ভগীরথ বললেন, প্রভু, আপনি যদি আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে গঙ্গাদেবী যাতে পৃথিবীতে নেমে আসেন তার ব্যবস্থা করে দিন। তিনি নেমে না এলে আমার পূর্বপুরুষদের উদ্ধার হওয়ার কোনোই আশা নেই।

ব্রহ্মা বললেন, গঙ্গা যখন স্বর্গ থেকে নামবেন, তখন মহাদেব ছাড়া আর কেউ তাঁর প্রচণ্ড বেগ ধারণ করতে পারবেন না। তুমি আগে তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করে রাজি করাও।

ভগীরথ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য হিমালয়ের উত্তরে কৈলাস পর্বতে গিয়ে ঘোরতর তপস্যা করতে লাগলেন। মহাদেব তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গার প্রচণ্ড জলধারা ধারণ করতে রাজি হলে এবং পর্বতের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে গঙ্গার জলধারা মাথায় ধারণ করলেন।

মহাদেবের জটা থেকে গঙ্গা পৃথিবীতে নামলেন আর ভগীরথ পথ দেখিয়ে শঙ্খ বাজাতে বাজাতে আগে আগে চললেন। ভূতলে গঙ্গার প্রবাহ কলকল শব্দে চারিদিক পূর্ণ করল। গঙ্গার জলে মাছ, কচ্ছপ, কুমির, হাঙ্গর প্রভৃতি জলজন্তু মহানন্দে খেলা করতে করতে ভেসে যেতে লাগল।

পথে গঙ্গার স্রোত জহ্নুমুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করে দিল। এতে মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গার সমস্ত জল পান করে ফেললেন। ভগীরথ মুনির স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। মুনি সন্তুষ্ট হয়ে নিজের জানু থেকে গঙ্গাকে বের করে দিলেন। এই কারণে গঙ্গার আর এক নাম হলো জাহ্নবী।

তারপর গঙ্গা ভগীরথের অনুগমন করতে করতে শেষে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হলেন। গঙ্গার জলরাশি সগরের ষাটহাজার পুত্রের ওপর পতিত হওয়া মাত্র তাঁরা দিব্যরূপ ধারণ করে স্বর্গে গমন করলেন। এইভাবে ভগীরথ কঠোর তপস্যাবলে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনেন। আজও এই গঙ্গার আর এক নাম ভাগীরথী।

(শাশ্বত ভারত থেকে)

ভারতের বিপ্লবী

দেবপ্রসাদ গুপ্ত

বিপ্লবী দেবপ্রসাদ গুপ্ত ১৯১১ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। কলেজে পড়ার সময় মাস্টারদা সূর্য সেনের প্রেরণায় বিপ্লবীদলে যোগ দেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় সশস্ত্র সংঘর্ষে তাঁর প্রাণ রক্ষা হলেও পুলিশ তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে। ১৯৩০ সালের ৬ মে চট্টগ্রামের কামারপোল এলাকায় সাহেবপাড়া অভিযানে সম্মুখ যুদ্ধে আহত হয়েও আত্মসমর্পণ না করে সঙ্গীগণ-সহ নিজ অস্ত্রে জীবনের সমাপ্তি ঘটান।

জানো কী?

- এফ আই আর-এর ফুলফর্ম হলো ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট।
- ভারতে প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সুচেতা কৃপালনী।
- জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি।
- মাউন্ট এভারেস্ট শৃঙ্গ নেপালে অবস্থিত
- বিহার রাজ্যের প্রাচীন নাম মগধ।
- দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম আনাইমুদি।
- সূর্যকিরণে ভিটামিন ডি থাকে।
- জালিয়াওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক ডায়ারকে হত্যা করেন উধম সিংহ।

ভালো কথা

বীণাদি

আমাদের পাড়ার বীণাদি তিন বছর হলো নার্সের চাকরি করছে। এখন মালদা জেলা হাসপাতালে কর্মরতা। যখন বীণাদি বাড়ি আসেন তখন পাণার সবার বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নেন। কীভাবে শরীর ভালো রাখতে হবে তার পরামর্শ দেন। সেদিন পাড়ার মেয়েদের এক জায়গায় ডেকে কীভাবে শরীর ভালো রাখতে হবে সে বিষয়ে অনেক কথা বলেন। তার মধ্যে একটি আমার খুব ভালো লেগেছে তা হলো প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং রাতের খাবারের পর ভালো করে মুখ ব্রাশ করতে হবে। তারপর ব্রাশটি সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে খুব ভালো ভাবে ধুয়ে রাখতে হবে। আর খুব বেশি পুরনো ব্রাশ ব্যবহার করা ঠিক নয়। বীণাদিকে গ্রামের সবাই খুব ভালোবাসে। আমারও বীণাদির মতো নার্স হওয়ার ইচ্ছা।

সুস্মিতা পাল, একাদশ শ্রেণী, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

প্রশ্ন

সুপর্ণা পাল, নবম শ্রেণী, রাজনগর, কদমতলা, ত্রিপুরা

ইংরেজরা এসেছিল
নিউ ইয়ার চাপিয়েছিল,
মোগল পাঠান এসেছিল
হিজরিটাও চাপিয়েছিল।
তখন ছিলাম পরাধীন
সবদিকেই ছিলাম হীন।

এখন আমরা হয়েছি স্বাধীন
কেন এখনো বহুক্ষেত্রে পরাধীন?
নেই আমাদের সাল তারিখ
বিদেশের লিখি, এটা কি ঠিক?
কবে আমরা আমাদের হবো
কবে আমরা গোলামি ভুলবো?

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

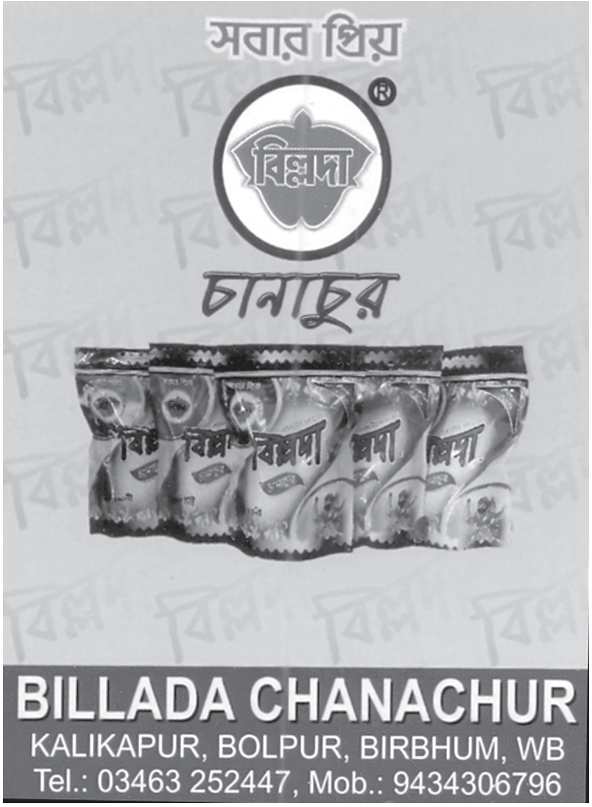

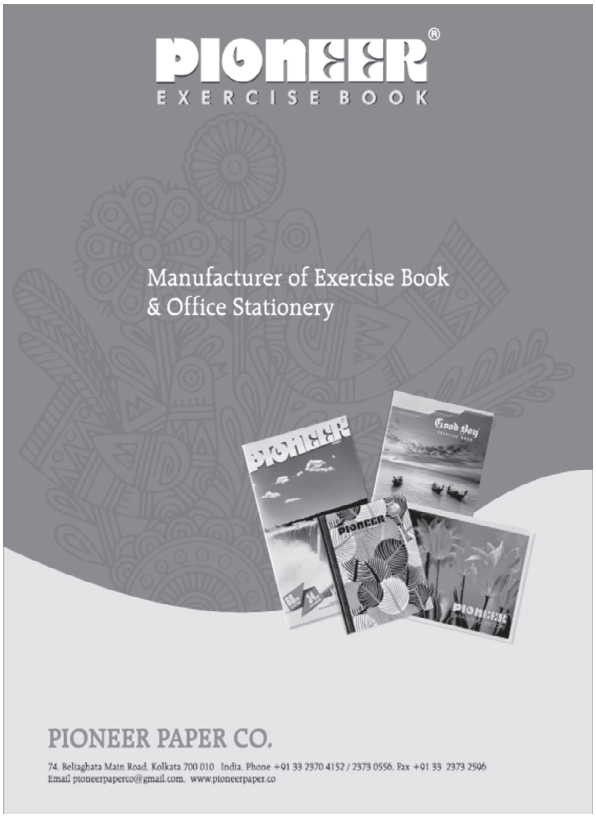

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সৌদি আরবের মতো ভারতেও তবলিগ-জামাত নিষিদ্ধ হোক

ধীরেন দেবনাথ

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। সম্প্রতি সৌদি আরব সরকার নিষিদ্ধ করেছে সেদেশে তবলিগ-জামাতকে। সৌদি প্রশাসন তবলিগ- জামাতকে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক বলে আখ্যা দিয়েছে। সৌদির ধর্ম মন্ত্রী ড. আবদুল লতিফ আল শেখ এক টুইট বার্তায় বলেছেন একথা এবং মসজিদের ইমামদের জুম্মা নামাজের সময় সব মুসুল্লিকে তবলিগ-জামাতের প্রকৃত রূপটি তুলে ধরে তাদের থেকে দূরে থাকার পরামর্শও দিতে বলেছেন। তবলিগ-জামাতকে 'সন্ত্রাসের আখড়া' বলেও উল্লেখ করেছে প্রশাসন। সরকারও এক ঘোষণায় বলেছে— তবলিগ-জামাত সন্ত্রাসবাদের একটি প্রবেশ পথ। এদের বিপদ সম্পর্কে মানুষকে বোঝান। এদের ভুলগুলি তুলে ধরুন।' এছাড়াও ১৯২৬ সালে 'দাওয়া' নামে গঠিত একটি সুন্নি মুসলমানদের সংগঠনকেও ওই একই কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আসলে মুসলমানরা 'দুনিয়ার মুসলমান ভাই ভাই' বললেও তাদের মধ্যে রয়েছে বহু গোষ্ঠী ও বহুমত। যেমন— সুন্নি, শিয়া, আহমেদিয়া, কাদিয়ানি, আজারবাইজানি, ইউসুফভাই, বাহাই, আহলে ইত্যাদি। আর গোষ্ঠী ও মতবিরোধে কারণে তাদের মধ্যে রয়েছে 'অহি-নকুল' সম্পর্ক। এক গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠীর শত্রু। প্রত্যেক গোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব মসজিদ। এক গোষ্ঠীর মসজিদে অন্য গোষ্ঠীর নমাজ বা প্রার্থনার অধিকার নেই। সবাই নিজেদের আল্লার বান্দা বললেও এক গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠীর কাছে 'কাফের' বা বিধর্মী। তাই তাদের মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দল, মারামারি, খুনোখুনি লেগেই আছে। আফগানিস্তান ও পাকিস্তান তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সুন্নিরা মহম্মদপন্থী, কিন্তু শিয়ারা আলিপন্থী। এদেরই কোনো কোনো গোষ্ঠী গান-বাজনার মাধ্যমে আল্লা-নবিদের গুণকীর্তন করলেও অন্য গোষ্ঠীরা বিশেষত সুন্নিরা এর ঘোর বিরোধী। তাই এদের কাছে অন্যরা বধযোগ্য কাফের। তাই কাফের হত্যা ও তাদের মসজিদ ধ্বংসও সুন্নি প্রভৃতি মুসলমানদের কাছে ইসলাম সম্মত তথা পুণ্যের কাজ। আর সেই কারণে বহু চর্চিত শিয়া-সুন্নি সংঘর্ষ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কাজেই বিশ্বে প্রতিদিন জাতি সংঘর্ষে যত মানুষ মরছে, তাদের অধিকাংশই মুসলমান। তাই 'ইসলামিক-ব্রাদারহুড' কথাটা নিতান্তই একটা মিথ্যে প্রচার। সব মুসলমান এক নয়।

এখানে উল্লেখ্য, অধিকাংশ সৌদি মুসলমান 'আহলে হাদিস' মতাদর্শে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে, তবলিগ-জামাত ওদাওয়া হচ্ছে সুন্নি মুসলমানদের সংগঠন। আবার বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান সুন্নি! ও আধিপত্য বিস্তারক। বিশ্বজুড়ে অশান্তির মূলে এরা। তবলিগ- জামাতের মাধ্যমে এরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সন্ত্রাসবাদ ও হিংসায় মদত জোগায়। এটা বহু দেশে তদন্তে উঠে এসেছে। এরা পরধর্ম অসহিষ্ণু এবং ইসলামিক বিশ্ব সৃষ্টির পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে বলে খবর। এদের কাজই হচ্ছে, দলবদ্ধভাবে সুন্নি মুসলমানদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মধ্যে জেহাদি মানসিকতা সৃষ্টি করা। এবং জেহাদে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। 'ইসলাম' অর্থ শান্তি। অথচ এদের কাজই হচ্ছে, বিশ্ব জুড়ে দাঙ্গা, জেহাদ তথা অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা। ২০২০ সালে এরা দিল্লিতে শুধু সাম্প্রদায়িকতাই ছড়ায়নি, ছড়িয়ে গেছে করোনাও। বিভিন্ন দেশে বিশেষত বাংলাদেশে এদেরই ইন্ধনে

বাস্তববাদী সৌদি সরকারের পথ অনুসরণ করে ভারত সরকারেরও উচিত ভারতে জেহাদি তবলিগ-জামাতকে নিষিদ্ধ করা।

ফঃ ৬

তবলিগ-জামাতপন্থী ইমাম, মোল্লা, মৌলবি তথা দাঙ্গাবাজ রাজাকার, আলবদর ও জেহাদিরা প্রতি বছর ইসলামিক জলসা থেকে হিন্দু (কাফের) বিদ্বেষী ভাষণের মাধ্যমে লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা, ধর্মান্তরকরণের মতো জেহাদি কর্মকাণ্ডে প্রেরণা জোগাচ্ছে। তাই এহেন মানবতার শত্রু জঙ্গি, জেহাদি ও সন্ত্রাসবাদী তবলিগ-জামাতি সংগঠনকে সৌদি আরব সরকার নিষিদ্ধ করে সঠিক কাজই করেছে।

তবে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ইসলামিক বা মুসলমান বিশ্বের প্রধান দেশ সৌদি আরবের সরকার বহু প্রাচীন ইসলামিক সংগঠন তবলিগ-জামাতকে 'সন্ত্রাসের আখড়া' আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে— যে দেশে ইসলামের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের জন্ম, যে দেশে নবি, খলিফাদের মতো ইসলাম মজহবিদের নেতাদেরও জন্ম, ধর্ম ও হজস্থান মক্কার কাবাশরিফ ও মদিনা অবস্থিত। এ ঘটনা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক ও অভূতপূর্ব। কারণ ইসলামের পীঠস্থানে ইসলামি রীতির অঙ্গ তবলিগ-জামাতও কোনো ইসলামিক সংগঠনকে ইতিপূর্বে কোনও সরকার নিষিদ্ধ করেনি। আর এ ঘটনা প্রমাণ করে, বিশ্বজুড়ে ইসলামি সন্ত্রাস, হিংসা ও হানাহানির দিন ফুরিয়ে আসছে। ইসলামি আধিপত্যবাদ বন্ধ হতে চলেছে। অতঃপর সৌদি সরকার সন্ত্রাসবাদী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। বিশ্বের শান্তিকামী দেশগুলিতে হাঁটতে পারে সেই পথে।

সত্যি বলতে কী, ইসলাম সৃষ্টির মূলেই রয়েছে হিংসা, রক্তপাত ও প্রাণহানি। এর বিস্তারের মূলেও রয়েছে তরবারি। ইসলাম প্রণেতা মহম্মদ নিজেই ইসলামের প্রসারে তরবারি হাতে বদর ও ওহুদের যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তখন আরবে ছিল শৈবধর্ম। কোরাইশরা ছিল শিবের উপাসক। মক্কার কাবাঘরে ছিল ৩৬০টি বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। ছিল সুবিশাল শিবলিঙ্গ। অধিকাংশ কোরাইশ ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃত হলে যুদ্ধ বাধে। অসংখ্য কোরাইশ হতাহত হয়। রক্তে ভেসে যায় মক্কা-মদিনা। অবশেষে রক্তপাত ও প্রাণহানি বন্ধে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়। সন্ধির শর্তানুসারে কৃষ্ণপাথর নির্মিত শিবলিঙ্গ কেটে চৌকোণ রূপ দিয়ে বসানো হয় কাবাগৃহে। আর সেটিই হচ্ছে কাবাশরিফ। এটি মুসলমানদের কাছে অতি পবিত্র। এটির চৌকোণ রূপ দেওয়ার কারণ বিশ্বের চতুর্দিক থেকে মুসলমানরা যাতে এই কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে পারে। তাই মুসলমানরা নিরাকার নয়, সাকার। কেননা নামাজের সময় তারা কাবা বা কৃষ্ণপাথরের উদ্দেশে মাথা ঠেকায়, প্রার্থনা করে ও কাবার রূপ স্মরণ করে। মক্কায় হজ করতে গিয়ে মুসলমানরা সাদা থান পড়ে ও গায়ে জড়ায়। হিন্দুদের বিগ্রহ পরিক্রমণের মতো তারাও কাবা পরিক্রমণ করে। আর এসবই হচ্ছে হিন্দু রীতি।

সৌদি আরবের বর্তমান বাদশা সালমান হচ্ছেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। প্রগতিবাদী ও আধুনিকমনস্ক। সিংহাসন দখলের পর তিনি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একনায়কতান্ত্রিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় রীতিনীতি এবং কঠোর ইসলামিক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে সুস্থ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু করেছেন সে দেশে। জনগণও আগের থেকে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক সুবিধা- সুযোগ ভোগ করছে। বিগত দিনের স্বৈরাচারী আইন ও শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটেছে। তাই সেদেশে বইছে আধুনিক বিশ্বের গণতান্ত্রিক হাওয়া। নারীরা ঘরের কোণে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তারা বোরখা-হিজাবের অন্তরাল থেকে বের হয়ে স্বাভাবিক পোশাকে প্রকৃতির মুক্ত আলো-বাতাস উপভোগ করতে পারছে। মেয়েরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছেলেদের মতোই আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া নারীরা চাকরি, খেলাধুলা, এমনকী পুলিশ হওয়ারও সুযোগ পাচ্ছে। তাদের গাড়ি চালানো, শপিংমল, হাট-বাজার, রেস্তোরাতে যেতেও বাধা নেই। স্কুল-কলেজে ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষাও পাচ্ছে। অর্থাৎ নারীরা এখন আর সন্তান জন্ম দেওয়ার যন্ত্রই নয়, ভোগ করছে পুরুষদের মতো সব অধিকার। স্কুল শিক্ষায় যুক্ত হয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের মতো ভারতীয় শিক্ষাও। এছাড়া শুধু সৌদি আরবেই নয়, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন মুসলমান দেশে ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, যোগ ও আধ্যাত্মিকতার চর্চা শুরু হয়েছে। আবুধাবিতে নির্মিত হতে চলেছে বিশাল স্বামীনারায়ণ মন্দির। ইরানে রয়েছে 'ইসকন'-এর কৃষ্ণমন্দির। বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলমান দেশে ইন্দোনেশিয়াতে রয়েছে রাম-সীতা, কৃষ্ণ ও হনুমান মন্দির। সেদেশে আজও বহমান হিন্দু সংস্কৃতি। আফগানিস্তান বা প্রাচীন গান্ধার ছিল গান্ধারীর জন্মস্থান। সেখানে ছিল হিন্দুধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, মন্দির ও দেবদেবীর বিরাট উপস্থিতি।

আফগানিস্তান প্রাচীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বিশ্ব মানবতার শত্রু তালিবান জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদীরা আফগানিস্তান দখল করার পর সেইসব প্রাচীন স্থাপত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান তথা শ্রদ্ধাবিন্দুগুলি ধ্বংস করে ফেলেছে। ধ্বংস করেছে বিশ্ববিখ্যাত বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তিটিও। এছাড়াও পাশ্চাত্যের প্রায় প্রতিটি দেশে রয়েছে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচলন এবং অসংখ্য মঠ-মন্দির। ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা বিভিন্ন দেশে রয়েছেন সরকারি, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

বাস্তববাদী সৌদি সরকারের প্রধান, বাদশা সালমান মক্কার কাবাশরিফ হিন্দুদের হাতে ফিরিয়ে দিলে তা আশ্চর্যের কিছু হবে না। বরং সেটাই হবে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত। বিশ্বের কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ হিন্দু সেটাই চাইছে। আর সেটাই হবে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। বন্ধু দেশ সৌদি আরবের পথ অনুসরণ করে ভারত সরকারেরও উচিত ভারতে জেহাদি তবলিগ-জামাতকে নিষিদ্ধ করা। ▯

পাল, পূঃবঃ, ৩৮+/৫'১০"/নর MVA (ফাইন আর্টস) গ্রাফিক ডিজাইনার, নিজস্ব এডিটিং হাউস, ডিডি নিউজ-এ ভিডিও এডিটর। শিক্ষিতা ঘরোয়া সুশ্রী দেব/নর অনূর্ধ্ব ৩৩ পাত্রী চাই। মোঃ ৬২৯১২০৬৬১৬

কলকাতা পুরভোট, শ্মশানের শান্তির ভোট

মণীন্দ্রনাথ সাহা

যা হবার তাই হয়েছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কলকাতা পুরভোটে ১৪৪টি আসনের মধ্যে তৃণমূল একাই পেয়েছে ১৩৪টি আসন। বিজেপি ৩টি, বামফ্রন্ট-২টি, কংগ্রেস-২টি এবং নির্দল ৩টি করে আসন পেয়েছে। এমনিতেই পুরসভা, পঞ্চায়েত, বিধানসভা বা লোকসভার উপনির্বাচনে শাসক দলের পক্ষেই বেশি করে জনমত প্রকাশ পায়। তার উপর কয়েকমাস আগে বিধানসভা ভোটে শাসকদল বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতা দখল করেছে। উপরন্তু বিধানসভা ভোটের আগে এবং ভোট পরবর্তী হিংসায় যেভাবে শাসকদলের পালিত সন্ত্রাসীরা বিরোধী তথা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হেনে ধনসম্পদ লুট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, ধর্ষণ, গৃহছাড়া করেছিল তা এক নজিরবিহীন ঘটনা ছিল। ওই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সমগ্র দেশ ও বিদেশেও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। আদালত পর্যন্ত সরকারকে ভর্ৎসনা করতে বাধ্য হয়েছিল। এই রকম একটা পরিস্থিতির কয়েকমাস পরে পুর ভোটে শাসক দলের জেতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তার প্রমাণ পাওয়া যায়— পুরভোটে ভোটের শতকরা হার ৬৩ শতাংশ হওয়ায়। এক কথায় বিরোধী দলের হিন্দুরা ভয়ে ভোট দিতে বাড়ি থেকে বেরোননি।

ভোটের পর শাসকদল থেকে শুরু করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ভোট 'শান্তিপূর্ণ' হয়েছে বলে দাবি করলেও তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। টিভির পর্দায় দেখা গিয়েছে— বোমাবাজি, রক্তপাত, এজেন্টদের মারধর করে বুথ থেকে বের করে দেওয়া, প্রার্থীদের নিগ্রহ, বুথের ভিতরে ধ্বস্তাধস্তি, মহিলা প্রার্থীর পোশাক ছিঁড়ে দেওয়া ও ভাঙচুরের দৃশ্য। পরিস্থিতি এতটাই মাত্রাছাড়া ছিল যে, সকলকে অবাক করে দিয়ে বড়তলা থানার সামনে ছাপ্পা ভোটের বিরুদ্ধে সিপিএম ও বিজেপিকে একসঙ্গে বিক্ষোভ দেখাতে দেখা গিয়েছে। এমন বিতর্কিত ভোটকে আর যাই হোক অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট বলা চলে না। অথচ পুরভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় প্রার্থীদের সভায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, অবাধ ভোটে যারা বাধা দেবে, তাদের বিরুদ্ধে দল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু তাঁর সব বুলিই ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হয়েছে। কেননা কলকাতা-সহ সমগ্র রাজ্যে এমন দুধেল গোরুর রমরমা। এরা কারও কথাকেই পাত্তা দেয় না। কারণ তারা জানে ওদের বিরুদ্ধে শাসকদল কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে না। আর ওরাই হলো বিরোধীদের জব্দ করার প্রধান হাতিয়ার। এইরকম এক পরিস্থিতিতে দেশভাগের আগের কিছু ঘটনা মনে পড়ছে।

১৯৪৬ সালের ১৬-১৮ আগস্টের কলকাতায় হিন্দু নরমেধ যজ্ঞের ভয়াবহতা দেখে দু'জন মানুষের প্রাণ হিন্দুদের জন্য কেঁদে উঠেছিল। তাঁরা ছিলেন— গোপাল পাঁঠা ওরফে গোপাল মুখার্জি এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। গোপাল পাঁঠা কিছু সঙ্গী-সাথী সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিক প্রতি আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে কলকাতার অবশিষ্ট হিন্দুদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন নরপিশাচ সোরাবর্দির কষাইদের হাত থেকে। আর ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি গান্ধী-নেহরুদের বদান্যতায় মহম্মদ আলি জিন্নার দাবি মতো সমগ্র বঙ্গপ্রদেশ যখন জিন্না পেতে চলেছিল সেই সময় বাঙ্গলার এই পশ্চিমাঞ্চলটুকু থাবা দিয়ে কেড়ে নিয়েছিলেন শুধুমাত্র হিন্দুদের বসবাসের জন্য। কিন্তু হিন্দুরা সেই শান্তি যেন কোনোদিন ভোগ করতে না পারে তার জন্য দেশভাগের পর থেকে চরিত্রহীন, লম্পট, বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত এক দেশদ্রোহী এবং তাঁর বংশধরেরা ভারতীয় সংবিধানের ওপর আক্রমণ হেনে খণ্ডিত ভারতকে পুনরায় যেন খণ্ড বিখণ্ড করা যায় তার ব্যবস্থা করে গেছেন। আর সেই সুযোগকে হাতিয়ার করে বাঙ্গলা তথা ভারতের সমস্ত হিন্দুদ্রোহী ও দেশদ্রোহীরা বাঙ্গলা ধ্বংসকারীকে পূর্ণ মদত দিয়ে চলেছে। তবেই ফলস্বরূপ রাজ্যে যে কোনো নির্বাচন হোক না কেন জেহাদিরা ভোটযুদ্ধে অগ্রণি ভূমিকা পালন করছে।

আজ সেই শান্তিপ্রিয় পশ্চিমবঙ্গ নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের অবস্থা পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের হিন্দুদের মতোই সঙ্গীন! বাংলাদেশের হিন্দুরা উচ্ছন্নে গেছে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাও উচ্ছন্নে যাবার পথে। এখানে হিন্দু মা-বোনের মান-ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই, বিষয় সম্পত্তি ভোগের কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই তো জমি বিক্রির সাইনবোর্ডে লেখা হয় জমি বিক্রি হবে তবে হিন্দুদের কাছে জমি বিক্রি করা হবে না। হিন্দুর জান-প্রাণ কচুপাতার জলের মতো টলায়মান। তার ঠাকুর-দেবতা, পূজার্চনা বিধর্মীর বিদ্বেষের শিকার। রাজ্যটি আন্তর্জাতিক চোরাচালান, মেয়ে, মাদক, অস্ত্রপাচার, গোরু পাচারের লীলাক্ষেত্রে পরিণত। সন্ত্রাসী ও দুষ্কৃতীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলে গণ্য। নিরাপরাধীর নিরাপত্তা নেই, অথচ অপরাধীর সাজা নেই।

কাজেই এরাজ্যে বর্তমান শাসকদল বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ বহাল তবিয়তে থেকে জেহাদিদের সাহায্যে শান্তিপ্রিয়দের টুঁটি চেপে ধরে রাজ করে যাবে। আর তখন যে কোনো নির্বাচন তা পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে তারা জয়ী হয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে বলবে দেশের মধ্যে একমাত্র এই রাজ্যেই গণতন্ত্র অটুট আছে আর কোনো রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। তাহলে কি এই স্বৈরাচারী সরকারের পতন হবে না? এক কথায় উত্তর— না। যেখানে গণতন্ত্রই নেই সেখানে গণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার ফেলা যায় না। যে সরকারের পুলিশ এবং প্রশাসন মেরুদণ্ডহীন, যারা ভয়ে, প্রলোভনে নিজের শিরদাঁড়া সোজা করে চলতে পারে না সেই পুলিশ ও প্রশাসনের দৌলতে ভোটের ফল পরিবর্তন করা কোনো সমস্যা নয়। উপরন্তু দুধেল গোরুরা যখন শিং বাগিয়ে শান্তিপ্রিয় ভোটারদের দরজায় গিয়ে বলবে— তোমরা ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে যেও না। গেলে আর ফিরে আসবে না। তখন কোনো শান্তিপ্রিয় ভোটার ভোট দিতে যাবার সাহস দেখাবেন? কাজেই সন্ত্রাসরাজ চলছে চলবে। শ্মশানের শান্তিতে ভোটও হবে।

আবাস যোজনায় কেন্দ্রের সাফল্য উৎসাহব্যঞ্জক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আবাস যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্য যথেষ্টই উৎসাহব্যঞ্জক। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি রিপোর্টে আবাস যোজনা, বিভিন্ন দরিদ্র বান্ধব প্রকল্প এবং ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদি নির্মাণশিল্প সম্পর্কিত কেন্দ্রের একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত এবং তার প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে গ্রাম থেকে শহরে কেন্দ্রের সুশাসন অব্যাহত। রিপোর্টটি সংক্ষেপে এখানে দেওয়া হলো।

সিদ্ধান্ত : মন্ত্রীসভা ২০২১ সালের মার্চের পরেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ ২, ১৭,২৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত রাখার অনুমোদন দিয়েছে। এটি গ্রামীণ এলাকায় 'সকলের জন্য আবাসন' নিশ্চিত করবে।

প্রভাব : গ্রামীণ এলাকায় 'সকলের জন্য আবাসন' নির্মাণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য মৌলিক সুবিধা-সহ 'পাকা ঘর' নির্মাণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য মৌলিক সুবিধা-সহ পাকা ঘর' নির্মাণের জন্য ১৫৫.৭৫ লক্ষ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। ২০২১ সালের ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণের অধীনে ২.৯৫ কোটি বাড়ির লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ১.৬৫ কোটি বাড়ি নির্মিত হয়েছে। অনুমান, ২০২২ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যে ২.০২ কোটি বাড়ির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবে। তাই ২.৯৫ কোটি বাড়ির সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রকল্পটি চালিয়ে যেতে হবে।

সিদ্ধান্ত : কেন-বেতওয়া নদীর আন্তঃসংযোগের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পে ব্যয় হবে ৪৪৬০৫ কোটি টাকা। এই প্রকল্পটি আট বছরে শেষ হবে।

প্রভাব : প্রকল্পটি ১০৩ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ এবং ২৭ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কেন-বেতওয়া লিঙ্ক প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নামে

একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা হবে। এটি মধ্যপ্রদেশের ছাতারপুর, পান্না ও টিকামগড় এবং উত্তরপ্রদেশের বান্দা, মাহোবা ও ঝাঁসির মতো খরাপ্রবণ এলাকায় ১০.৬২ লক্ষ হেক্টর পর্যন্ত বার্ষিক সেচ প্রদান করবে। খালটি যুক্ত হলে প্রায় ৬২ লক্ষ মানুষ পানীয় জল পাবেন। কৃষি কার্যক্রম বৃদ্ধি বুন্দেলখণ্ডের অনগ্রসর অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। জল সংকটের কারণে এই অঞ্চলের মানুষদের বাসস্থান পরিবর্তন প্রবণতাও রোধ করবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত : 'মেড ইন ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর চিপসে'র স্বপ্ন পূরণ হবে যার জন্য সরকার ৭৬.০০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে।

প্রভাব : বর্তমান যুগে স্মার্টফোন-সহ অধিকাংশ ইলেকট্রনিক দ্রব্যে সেমিকন্ডাক্টর চিপ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। এখন তা ভারতেও তৈরি করা হবে। আগামী ৬ বছরের দেশে সেমিকন্ডাক্টর তৈরির জন্য একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে। এর আওতায় দেশে সেমিকন্ডাক্টর চিপসের ডিজাইন, ফেব্রিকেশন, প্যাকেজিং, টেস্টিং তৈরি করা হবে। এজন্য ৭৬ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ অনুমোদন করা হয়েছে। ভারতকে গ্লোবাল হাব হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পিএলআই স্কিমের অধীনে ২.৩ লক্ষ কোটি টাকার অনুদান দেওয়া হবে। এটিকে মিশন মোডে চালানোর জন্য ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন স্থাপন করা হবে।

সিদ্ধান্ত : প্রধানমন্ত্রী কৃষি সঞ্চয় যোজনার মেয়াদ ২০২১ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর বাড়ানোর প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রভাব : প্রধানমন্ত্রী কৃষি সঞ্চয় যোজনার মাধ্যমে ২.৫ লক্ষ তফশিলি জাতি এবং ২ লক্ষ তফশিলি উপজাতির কৃষক-সহ দেশের মোট ২২ লক্ষ কৃষক উপকৃত হবে।

শোকসংবাদ

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক তথা ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের রাজ্যকমিটির সদস্য তপন

দাসের মাতৃদেবী বিভাবতী দাস গত ২৪ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ পুত্রবধূ ও ২ নাতি রেখে গেছেন।

* * *

খড়্গপুর নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক মহেশ আগরওয়াল গত ৩১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৩ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

মঙ্গলনিধি

মালদা জেলার গাজোল খণ্ডের শিবাজীনগর শাখার স্বয়ংসেবক উত্তম সাহার বিবাহ উপলক্ষ্যে গত ১৫ ডিসেম্বর তাঁর পিতা অনিল সাহা মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন। উপস্থিত ছিলেন গাজোল খণ্ডের দুই কার্যবাহ দিলীপ সরকার ও বিপুলবন্ধু বাগচী এবং খণ্ড প্রচারক বাদল রায়।

সুশাসনে সর্বোচ্চ স্থানে গুজরাট—সর্বনিম্ন স্থানে পশ্চিমবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ঘটনাটা প্রত্যাশিতই ছিল। তাই পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে বিস্মিত হওয়া বা বিস্ময় প্রকাশ করবার কোনো কারণই ছিল না। আসলে, পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার দিনে কেমন পরীক্ষা হলো, তা তো পরীক্ষার্থীই সবচেয়ে ভালো বলতে পারে। পরীক্ষা দিয়ে এসে কেউ যদি বলে যে সে সমস্ত প্রশ্নের একেবারে সঠিক উত্তর লিখে এসেছে কিন্তু ফল প্রকাশিত হওয়ার পরে দেখা যায় যে, পরীক্ষার্থী 'শূন্য' পেয়ে একেবারে সর্বনিম্ন স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, সে তখন দোষ দেয় পরীক্ষা-ব্যবস্থা ও পরীক্ষকদের উপরে।

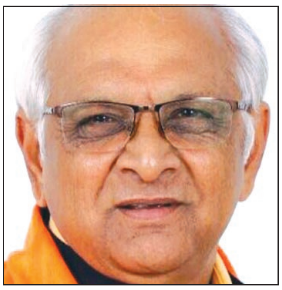

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছে সম্প্রতি ভারত সরকারের Good Governance বা সুশাসনের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার একেবারে পরেই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রকাশ করেছে ২০২১-এর Good Governance Report, যা Good Governance Index দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই রিপোর্ট ভারতের সমস্ত রাজ্য ও সকল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সামগ্রিক অবস্থার নিরিখেই প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে গুজরাট এবং তার পরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র ও গোয়া। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে দিল্লি সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো পশ্চিমবঙ্গ এই তালিকায় সর্বনিম্ন স্থানে পৌঁছেছে। এর অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর অযৌক্তিক দাবি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একেবারেই হাস্যকর, অবান্তর ও পুরোপুরি বাতিল হয়েছে। সব কিছুতেই সেরা, বাংলাই পথ দেখায়, দেশের এক নম্বর রাজ্যই হলো পশ্চিমবঙ্গ— এই সব দাবি যে সর্বৈব মিথ্যা, তা এই রিপোর্টে আবারও প্রমাণিত।

কী বলা হয়েছে এই রিপোর্টে? কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কতটা ভালোভাবে শাসন পরিচালনা করছে বা এককথায় কতটা সুশাসিত, তারই ফলাফল হলো এই রিপোর্ট। এতে সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির দিকে নজর দেওয়া হয়। এবারের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, যে সকল রাজ্য ২০২১-এর এই রিপোর্টে নিজেদের মানের উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছে, তাদের সংখ্যা হলো কুড়ি। এদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ ২০১৯ থেকে ২০২১-এর মধ্যে উন্নতি করেছে ৮.৯ শতাংশ। এমনকী জম্মু ও কাশ্মীরও শতকরা ৩.৭ শতাংশ উন্নতি করেছে। এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, গুজরাট শতকরা ১২ শতাংশেরও বেশি মানোন্নয়ন ঘটিয়েছে। এ ব্যাপারে একটা রাজ্যের কথা তো অবশ্যই বলা দরকার। তা হলে গোয়া। দরকার এই কারণেই যে, বর্তমানে তৃণমূলের লক্ষ্য গোয়া দখল; ব্যাপারটা এতই হাস্যকর যে, এক সর্বনিম্ন স্থানে থাকা রাজ্যের শাসকদল প্রায় সর্বোচ্চ স্থানে থাকা রাজ্য গোয়াদখলে জন্য কতই না চেষ্টা করে চলেছে! তবে সব চেষ্টাই যে বৃথা, তা কিছুদিন আগেই প্রমাণিত হয়েছে। ঘটা করে যাদের তৃণমূলে যোগদান করানো হয়েছিল, তারাই একটি করে চিঠি লিখে ঘটা করে তৃণমূলত্যাগ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস গোয়াবাসীদের কাছে গুন্ডা ও সাম্প্রদায়িক আখ্যাতেও ভূষিত হয়েছে। আসলে, পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য কোনো রাজ্যেই ভিক্ষাভাতা চলে না। তাই, অতি সস্তায় নেশার পানীয় সরবরাহকারী এবং ভিক্ষাভাতা প্রদানকারী তৃণমূল কংগ্রেসও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কোনো রাজ্যেই ঠাঁই পায় না। যে গোয়া দখলের জন্য পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল এত উদ্‌গ্রীব, সেই গোয়া সুশাসনের প্রশ্নে নিজেদের মানোন্নয়ন ঘটিয়েছে। তাই গোয়ায় যে তৃণমূল কংগ্রেস কোনো ভাবেই পাত্তা পায় না, তা তো এক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য।

সার্বিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে মোট চারভাবে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ-বি-তে আছে গুজরাট, মহারাষ্ট্রের মতো উন্নত রাজ্যগুলি। গ্রুপ-এ-তে আছে পশ্চিমবঙ্গ-সহ কিছু অনুন্নত ও উন্নয়শীল রাজ্য। গ্রুপ-সি-তে আছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও মূলত পাহাড়ি রাজ্যগুলি এবং গ্রুপ-ডি-তে রয়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি। কৃষিকাজ ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষেত্র, সামগ্রিক পরিকাঠামো, ব্যবসা-বাণিজ্য, জনস্বাস্থ্য, বিচারব্যবস্থা, নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থনৈতিক সুশাসন প্রভৃতি দশটি ক্ষেত্র বেছে নিয়ে তার ভিত্তিতেই সামগ্রিক সুশাসন নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ বরাবরই পিছিয়ে পড়া রাজ্য। কিন্তু সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী তার স্থান দেশের মধ্যে সবার নীচে। বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, এই রাজ্যের বিজ্ঞাপনলোভী, ষড়যন্ত্রকারী এবং প্রকৃত সত্যকে সর্বদাই চেপে রাখা তথা স্তাবক গণমাধ্যমগুলি অবশ্য এতে পাত্তা দিতে রাজি নয়। সুশাসনের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ উন্নতি তো দূরের কথা বরং শতকরা ৬ শতাংশ অবনতি করেছে। এটাই এই রাজ্যের বাস্তব চিত্র। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, পরিকাঠামো ইত্যাদি কোনো কিছুই এই রাজ্যে আশাজনক নয়। আসলে গুজরাট-মডেলেই যে ভারতের সেরা মডেল, তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল।

ভারত-রাশিয়া সম্পর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ৬ ডিসেম্বর নয়া দিল্লিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে বৈঠক দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও চাঙ্গা করে তুলেছে।

২৮টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে দুই দেশের মধ্যে।

রাশিয়া ও ভারত ২০২৫ সালের মধ্যে দ্বিমুখী বিনিয়োগে ৫০ বিলিয়ন ডলার অর্থ খরচ করবে এবং বাণিজ্যে ৩০ বিলিয়ন ডলারের গণ্ডি অতিক্রম করতে চায়। প্রেসিডেন্ট পুতিনের এই সফরে ২৮টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

দুই দেশের বৈঠকে যোগাযোগ থেকে শুরু করে সামরিক সহযোগিতা, জ্বালানি থেকে মহাকাশ খাতে অংশীদারিত্ব পর্যন্ত অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শোয়েগুর সামনাসামনি আলোচনাও হয়েছে। দুই দেশ আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ পরিবহণ করিডোরের পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হয়েছে। একই সময়ে, উভয় পক্ষ শীঘ্রই ভারতের চেন্নাই থেকে রাশিয়ার ভ্লাদিভোস্টকের সঙ্গে সংযোগকারী সামুদ্রিক করিডোরের কাজ ত্বরান্বিত করতে সম্মত হয়েছে। ভারত এবং রাশিয়া তাদের সামরিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা চুক্তি আরও ১০ বছরের জন্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সন্ত্রাসবাদের জন্য আফগানিস্তানের ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া যাবে না বলেও উভয় দেশ একমত পোষণ করেছে। যৌথ বিবৃতিতে, দুই দেশ আল কায়দা, আইএসআইএস এবং লস্কর-ই- তৈবার মতো সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।

সত্য ইতিহাস প্রকাশ খড়্গপুর আইআইটি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সত্য ইতিহাস প্রকাশ করে চলেছে খড়্গপুর আইআইটি। গৌরবময় অতীত ভারতের কথা নবীন প্রজন্মের সামনে উপস্থাপিত করেছে তারা। খড়্গপুর আইআইটি-র সেন্টার অব একসিলেন্স ফর ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম-এর পক্ষ থেকে ইংরেজি ২০১২ সালের ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে। ক্যালেন্ডারের নাম— রিকোভারি অব দ্য ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম। ক্যালেন্ডারের ১২টি পাতায় সিন্ধুসভ্যতা, চাকার যুগ, স্থান-কাল- সময়, অরৈখিক প্রবাহ পরিবর্তন, আর্য ঋষি, মহাজাগতিক আলো ও সময়ের যুগ, ধ্বনিবিদ্যা ও প্রেক্ষাপট, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত ভারতমাতা, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দের চিত্র এবং বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে। আর্য আক্রমণের মিথ্যাতত্ত্ব এবং বিশ্ব যুদ্ধের মতো বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

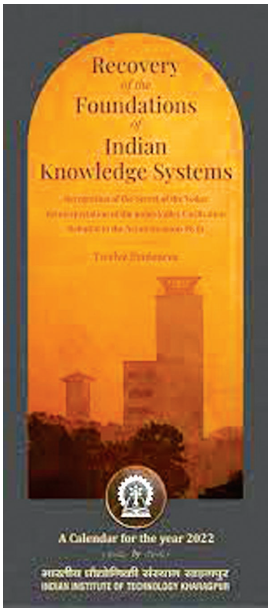

খড়্গপুর আইআইটি-র মতো দেশের অগ্রগণ্য বিজ্ঞান সংস্থা সত্য বিষয় নবপ্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরাতে স্বাভাবিকভাবেই মিথ্যার কারবারিরা খেপে উঠেছেন। তারা খড়্গপুর আইআইটি-র সামনে বিক্ষোভও দেখিয়েছেন। বামমার্গী ও সেকুলাররা এতদিন যে প্রকৃত সত্যকে চেপে রেখেছিলেন, তা এখন প্রকাশ পাওয়ায় তাঁরা মুখ লুকানোর জায়গা পাচ্ছেন না। তাঁদের অভিযোগ, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিষ্ঠানের ক্যালেন্ডারে পুরাণকথা কেন ঠাঁই পাবে? খড়্গপুর আইআইটি-র সেন্টার অব একসিলেন্স ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের চেয়ারম্যান ড. জয় সেন বলেন, বিতর্কের কোনো প্রশ্নই নেই, বরং আর্য আক্রমণ তত্ত্ব নিয়ে যে ভুলভ্রান্তি ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করেছে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে এই ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে। তিনি জানান, ক্যালেন্ডারের ১২টি পাতায় ১২টি বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ আবেদন

ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও সকলের সহযোগিতায় ৭৪ বছর ধরে স্বস্তিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। স্বস্তিকা নিরপেক্ষ নয়, রাষ্ট্রীয়তার পক্ষে। রাষ্ট্রবাদী মানুষ হিসেবে আপনি যে কথা জানতে চান, স্বস্তিকার পাতায় আপনি তা পাবেন।

বাজার চলতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যেখানে দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ থাকে না, অন্যান্য লেখার ভিড়ে আসল তথ্যটাই যেখানে হারিয়ে যায়, স্বস্তিকা সেখানে সত্যটাকেই তুলে ধরে। স্বস্তিকার লেখায় তখন আপনি মনের কথাটি খুঁজে পাবেন। এক কথায়, স্বস্তিকা জাগ্রত হিন্দু চেতনার তথা ভারতাত্মার কণ্ঠস্বর।

সর্বভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক হাল-হকিকত এবং প্রকৃত চিত্রটি জানতে হলে স্বস্তিকা পড়তে হবে। স্বস্তিকার প্রতিটি সংখ্যাই বিষয়, বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। ভারতের পরম্পরা ও আধুনিকতার এ এক অসাধারণ মেলবন্ধন। পরিবারের সবার সঙ্গে বসে পড়ার মতো পত্রিকা।

এবছর স্বস্তিকা ৭৫ বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। এই উপলক্ষ্যে পক্ষকালব্যাপী স্বস্তিকার গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২, মঙ্গলবার এই গ্রাহক অভিযানের সূচনা। ৫০০ টাকা দিয়ে আপনিও স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহক হোন— এটাই আমাদের অনুরোধ। পূজাসংখ্যা-সহ এক বছরে প্রকাশিত স্বস্তিকার সব সংখ্যাই আপনি বার্ষিক গ্রাহক হিসাবে পাবেন। স্বস্তিকা আপনার সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার প্রত্যাশী।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার ২৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের সংখ্যাটি ‘স্বাধীনতা-৭৫’ বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। এজন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বস্তিকা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকার শ্রীবর্ধনের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের রেট

প্রতি কলাম সেন্টিমিটার
(কালো/সাদা) ১৫০ টাকা
প্রতি কলাম সেন্টিমিটার
(রঙিন) ২২৫ টাকা

যোগাযোগ : জয়রাম মণ্ডল :
৮৬৯৭৭৩৫২১৫, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
বিজ্ঞাপন পাঠানোর শেষ তারিখ :
১০ জানুয়ারি, ২০২২

With Best Compliments
from -

A
Well Wisher

।। চিত্রকথা ।। শ্রীগুরুজী ।। ২০ ।।